- নবীন চিকিৎসকগণ নিজের জ্ঞান পরীক্ষা করুন
- নাৎসি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে নোবেল জয়
- বাংলাদেশ : আইন ও তার প্রয়োগ
- খরগোশের দৌড়

PHPC Special Photo Contest 2021
On the Occasion of the
GOLDEN JUBILEE
BANGLADESH'S INDEPENDENCE
বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

মাসিক গণস্বাস্থ্য

৪০ বর্ষ ৯ম সংখ্যা / পৌষ ১৪২৮

বাঙালির অসুখবিসুখ

শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক ও অসুস্থদের প্রতিদিন

মিনাভিট খাওয়ান

কম খরচে-অধিক পুষ্টি

মিনাভিটে

রয়েছে শরীরের জন্য
অতীব প্রয়োজনীয়
২৫ টি ভিটামিন
আমিষ ও খনিজ পদার্থ।

গণস্বাস্থ্য ফুডস্ লিমিটেড

ঢাকা কার্যালয় : ১৬০, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
কারখানা : বিসিক শিল্পনগরী, কক্সবাজার-৪৭০০, বাংলাদেশ

(জেলা/উপজেলা ভিত্তিক পরিবেশক নিয়োগ দেয়া হবে। মোবাইল : ০১৮১০০৬১৩৭৩)

বাজারের থ্রী-পিছের জগতে

মেসার্স নিউ সানরে এন্টারপ্রাইজ

একটি স্বনামধন্য নাম

M/S NEW SUNRAY ENTERPRISE

M/S. New Sunray Enterprise

Shop # 28/29, I.T.C Tower, 26/26/01
Ahasanullah Road, Nowab Bari
(Pukur Par), Islampur, Dhaka-1100

REGISTRATION NO. DA-490 ♦ 40 Year, 9 Issue, Poush 1428 (December 2021) ♦ MONTHLY GONOSHASTHAYA

Published by Md. Zakaria from Gonoshasthaya Prokashana, Dhaka-1344 and Printed by him from Gonomudran Limited, Dhaka-1344
মোঃ জাকারিয়া কর্তৃক গণস্বাস্থ্য প্রকাশনা, ঢাকা-১৩৪৪ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক গণমুদ্রণ লিমিটেড, ঢাকা-১৩৪৪ থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ শিল্পী : মিতা মেহেদী

প্রতি কপির মূল্য : ১৫ টাকা

মাসিক প্রকাশনার ৪০ বছর ১৩৮৮-১৪২৮

মাসিক গণস্বাস্থ্য

Monthly Gonoshasthaya 40 Years of Publications 1388-1428

৪০ বর্ষ ৯ম সংখ্যা / পৌষ ১৪২৮

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি
ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী

সম্পাদক
বজলুর রহিম

সম্পাদকীয় কার্যালয় :
মাসিক গণস্বাস্থ্য
শহীদ রফিক-জব্বার মহাসড়ক
পোঃ মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টনমেন্ট
ঢাকা-১৩৪৪, বাংলাদেশ

Chairman, Editorial Board
Dr. Zafrullah Chowdhury

Editor
Bazlur Rahim

EDITORIAL OFFICE :
Monthly Gonoshasthaya
Shahid Rafique-Jabbar Mahasarak
P.O. Mirzanagar via Savar Cantt.
Dhaka-1344, Bangladesh

Phone :
(880-2) 7791979, 7792331

E-mail :
gonoshasthaya.monthly@gmail.com

'মাসিক গণস্বাস্থ্য' পত্রিকায় প্রকাশিত চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাবলী পেশাদার চিকিৎসা পরিষেবার (Professional Medical Care) বিকল্প নয়। আমাদের মূল লক্ষ্য রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ে পাঠকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তৎসংক্রান্ত সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্য তুলে ধরা। কেবলমাত্র আপনার সংবেদনশীল চিকিৎসকই শারীরিক কোন সমস্যা বা রোগ নিরূপণ ও তার চিকিৎসা সঠিকভাবে করতে সক্ষম। নিজে নিজের চিকিৎসা করবেন না।

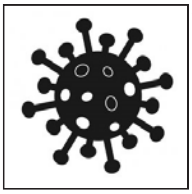

আজ থেকে দু'বছর আগে চীন থেকে কোভিড-১৯ যে প্রলয়যাত্রা শুরু করেছিল তা এখনো থেমে নেই। চীনের উহানে যার সূত্রপাত, বিশ্বজুড়ে সেটি এখনো তার দাপট দেখিয়ে চলছে। অর্থাৎ টিকা, মাস্ক ও অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে গুরুতর অসুস্থতা, মৃত্যু এবং হাসপাতালে ভর্তির হার কিছুটা কমলেও জনজীবন এখনো স্বাভাবিক হয়ে উঠেনি। মৃত্যু এবং আক্রান্ত মানুষের সংখ্যার উঠানামার হার দেখে অনুমান করা কঠিন এই মহা দুর্যোগের অবসান কবে হবে।

গত প্রায় দু'বছর ধরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি থমকে গেছে। কোথাও কোথাও অনলাইনে শিক্ষাকার্যক্রম চালু আছে বটে কিন্তু মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের এই ভয়াবহ সময়ে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা, সেখানে অনলাইনে শিক্ষাকার্যক্রমে অংশগ্রহণের সামর্থ্য কতজন শিক্ষার্থী রাখে? শিক্ষাক্ষেত্রে এই স্থবিরতার জন্য ভবিষ্যতে জাতিকে চড়া মূল্য চুকাতে হবে।

এর মধ্যে একটা বেদনাবহ পরিসংখ্যান মার্কিন সংবাদপত্র *The Dallas Morning News*-এ প্রকাশিত হয়েছে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। The Pandemic Within the Pandemic শিরোনামাঙ্কিত সংবাদে বলা হয়েছে : ১৪০,০০০ মার্কিন শিশু করোনার কারণে এতিম হয়েছে। অর্থাৎ উপরোক্ত সংখ্যক শিশু পৃথিবীকে ভালভাবে জানার আগেই তাদের মা-বাবাকে হারিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে মা-বাবাকে হারিয়ে এমন এতিম হওয়া শিশুদের সংখ্যা ৫০ লক্ষ। কোভিড-এর আক্রমণ যেহেতু থেমে নেই, এই সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। ৫০ লক্ষ এতিম শিশুর এই হিসাব কেবল পরিসংখ্যানে উঠে আসা একটি সংখ্যা বটে; কিন্তু এর সাথে কত লক্ষ লক্ষ পরিবারের কান্না, ক্ষুধা, ভবিষ্যতের দুঃসহ যাতনার চিত্র লুকিয়ে আছে তার হিসাব হয়ত কোনোদিন জানা যাবে না। আর বাংলাদেশে কত সংখ্যক শিশু এই করোনাকালে তাদের মা-বাবাকে হারিয়ে এতিম হয়েছে তার যথাযথ হিসাব সংরক্ষিত আছে কিনা আমাদের জানা নেই।

তবু এই দুঃসহ সময়ে জীবন চলবে তার নিয়মে। আমাদের প্রত্যাশা দেশের সব মানুষকে টিকার আওতায় আনা হোক, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হোক এটুকু নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীকে এবং অবশ্যই মাফিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের লাগামহীন মুনাফার রাশ টেনে ধরতে হবে।

ইংরেজি নতুন বছর (২০২২) সবার জন্য কল্যাণ ও স্বস্তি বয়ে আনুক।

সূচীপত্র

বিশ্বস্বাস্থ্য	২
নবীন চিকিৎসকগণ নিজের জ্ঞান পরীক্ষা করুন	৬
খরগোশের দৌড়/ আরিফ মাহমুদ	৭
ফ্যাট নিয়ে বিভ্রান্তি : তেল-চর্বির ভালো-মন্দ / আরাফাত রহমান	৯
নাৎসি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে নোবেল জয় / সিদ্ধার্থ মজুমদার	১৩
প্রচ্ছদ রচনা / বাঙালির অসুখবিসুখ / নৃপেন ভৌমিক	১৫
বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা	২৩
যে-পাঁচটি ওষুধের মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে	৩১
মধু : সবচেয়ে আদিম সুখাদ্য / শান্তা আনোয়ার	৩৩
পুনর্মুদ্রণ / বাংলাদেশ : আইন ও তার প্রয়োগ / জাফরুল্লাহ চৌধুরী	৩৫
শিশু-কিশোর বিভাগ / গ্রন্থনা : ড. আমানুল ইসলাম	৪১
ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি / এম এ মোমেন	৪৩
নবীন চিকিৎসকগণ নিজের জ্ঞান পরীক্ষা করুন	৪৬
ধারাবাহিক / মশা থেকে সৃষ্ট ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও অন্যান্য অসুস্থতা	৪৭

আজীবন গ্রাহক চাঁদা : বাংলাদেশে : ৫,০০০.০০ টাকা ♦ ভারতে : ভারতীয় মুদ্রায় ৩,০০০.০০ রুপি, বাংলাদেশী মুদ্রায় ৮,০০০.০০ টাকা
বাংলাদেশে পাঁচ বৎসরের গ্রাহক চাঁদা : ১,০০০.০০ টাকা ♦ তিন বৎসরের গ্রাহক চাঁদা : ৬৫০.০০ টাকা ♦ বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা : ২৫০.০০ টাকা
[পত্রিকার সকল শ্রেণীর গ্রাহক চাঁদার সঙ্গে ডাক খরচ অন্তর্ভুক্ত]

মোঃ জাকারিয়া কর্তৃক গণস্বাস্থ্য প্রকাশনা, ঢাকা-১৩৪৪ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক গণমুদ্রণ লিমিটেড, ঢাকা-১৩৪৪ থেকে মুদ্রিত

প্রতি কপির মূল্য : ১৫.০০ টাকা

বি শ্ব স্বা স্থ্য

বিশ্বের নানা দেশে প্রকাশিত বিভিন্ন চিকিৎসা সাময়িকী ও দৈনিক সংবাদপত্র থেকে সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদ, চিকিৎসা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত নতুন গবেষণা সংবাদ, রোগ-তথ্য, ওষুধের খবর, চিকিৎসাসংক্রান্ত নতুন উদ্ভাবন ও অন্যান্য সংবাদ এই বিভাগের জন্য চয়ন করা হয়েছে।

মাঠে ফুটবল খেলোয়াড়দের অবস্থানভেদে মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হওয়া নির্ভরশীল

ফুটবল খেলোয়াড়রা কোন্ অবস্থান থেকে খেলেন তার উপর নির্ভর করে তার স্নায়বিক রোগে (Neurodegenerative Diseases) আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ ২০১৯ সনে ৭৬৭৬ জন প্রাক্তন ফুটবলার ও ২৩০৮ জন সুস্থ নাগরিকের মধ্যে এ বিষয়ে তুলনা করে তথ্য পেয়েছেন যে, প্রাক্তন ফুটবলারদের মধ্যে সাধারণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় তিনগুণ বেশি মৃত্যু হয়েছে।

গবেষকগণ আরও লক্ষ্য করেছেন যে, ৫ বৎসর ধরে যারা খেলেছেন, তাদের তুলনায় ১৫ বৎসর ধরে যারা ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করছেন তারা ৫ গুণ বেশি স্নায়বিক রোগে (Neurodegenerative Diseases) আক্রান্ত হয়েছেন।

গবেষকগণ ১৯৩০ থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত ফুটবলারদের পর্যবেক্ষণ করেছেন। অপর গবেষক উলি স্টুয়ার্ট দেখেছেন যে, যারা খেলার সময় মাথায় বেশি ফুটবল নিয়েছেন তারা অধিক সংখ্যায় পুরানো আঘাতজনিত মস্তিষ্ক বিকার (Chronic Traumatic Encephalopathy)-এ আক্রান্ত হয়েছেন।

৭৬৭৬ জন ফুটবলারদের মধ্যে ৩৮৬ জন (৫%) স্নায়বিক রোগে (Neurodegenerative Diseases) আক্রান্ত হয়েছেন। অপরপক্ষে ২৩,০২৮ জন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৩৬৬ জন (১.৬%) একই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রমণাত্মক ফুটবলারদের তুলনায় প্রতিরোধকারীগণ (Defenders) ৪.৯৮% অর্থাৎ ৫ গুণ বেশি স্নায়ুবিক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

British Medical Journal, 7-14 August 2021

ফাইজার কোম্পানির কোভিড-১৯ টিকার কার্যকারিতা প্রতি মাসে ৩% কমে

ফাইজার বায়োনটেক সারস কোভিড-২ (SARS Covid-2) ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা প্রতি মাসে ৩% কমে। ফাইজার টিকা নেবার ৭ দিন থেকে দুই মাস পরে ৯৬.২% নেমে আসে। দ্বিতীয় ডোজের প্রাক্কালে চার মাস পরে কার্যকারিতা ৮৩.৭% নেমে আসে। তাই তৃতীয় ডোজ নেবার প্রয়োজনীয়তা আসে।

British Medical Journal, 7-14 August 2021

টিকা নেবার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যোগাযোগ করুন

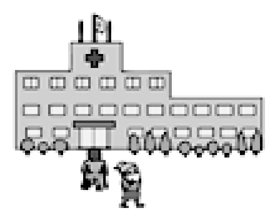

করোনা টিকা নেবার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে ভ্যাকসিন সৃষ্ট ইমিউন থ্রমবোসাইটোপেনিয়া থ্রম্বোসিস (Immune Thrombocytopenia Thrombosis – VITT) চিকিৎসার জন্য সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যোগাযোগের পরামর্শ দিচ্ছে ব্রিটেনের স্বাস্থ্য বিভাগ।

British Medical Journal, 7-14 August 2021

স্কটল্যান্ডে ২০২০ সালে অতিরিক্ত মাত্রার ওষুধ সেবনে ১৩৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে

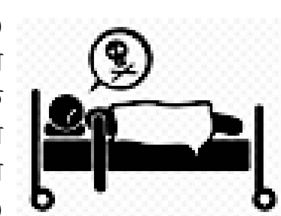

গত বছর (২০২০ সালে) ইউরোপের সকল দেশের মধ্যে স্কটল্যান্ডে অতিরিক্ত মাত্রার ওষুধ সেবনের কারণে সবচেয়ে বেশি রোগীর মৃত্যু হয়েছে। পূর্ববর্তী (২০২৯) বছরের তুলনায় ২০২০ সনে ৫% বেশি রোগীর মৃত্যু হয়েছে। অতিরিক্ত ওষুধ সেবনের কারণে ১৩৩৯ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্কটিশ সরকার আগামী ৫ বছরে ২৫০ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড (২৫০০ কোটি টাকা) বরাদ্দ করেছেন।

British Medical Journal, 7-14 August 2021

হাঁটুর ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করতে কতক জুতো উত্তম

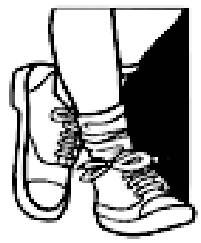

হাঁটুতে ব্যথা হলে আপনি তা থেকে মুক্ত হতে চাইবেন যাতে হাঁটার সময় প্রতি পদক্ষেপে নড়বড়ে বা ছটফটানি অনুভূত না হয়। গত ১২ জানুয়ারি ২০২১ *Annals of Internal Medicine*-এর অনলাইন সংস্করণে যাদৃচ্ছিকভাবে (Randomly) পরিচালিত ক্ষুদ্র একটি ট্রায়ালের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, এক ধরনের জুতো এই কাজের জন্য উপযুক্ত। গবেষকরা হাঁটুর পরিমিত বা হাঁটুর তীব্র সন্ধিপ্রদাহ আছে এমন ৫০ বা অধিক বয়সের ১৬৪ জন মানুষকে নিয়ে এই গবেষণাটি চালনা করেন। যাদৃচ্ছিকভাবে এদের অর্ধেককে তেমন একটা বাঁকানো যায় না এমন পুরু তলিযুক্ত সুস্থিত, সহায়ক জুতো পায়ে দিতে বলা হলো। বাকী অর্ধেকদের জন্য পাতলা, নমনীয় তলিযুক্ত জুতো নির্দিষ্ট করা হয়। কিছু মানুষের ধারণা এই ধরনের জুতো পায়ের ও আঙুলের স্বাভাবিক নড়াচড়ায় সহায়ক। উভয় দলই নির্দিষ্ট জুতো দৈনিক ছয় ঘন্টা পরিধান করে এবং উক্ত সময় হাঁটার মতো কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়। ছয় মাস পর, সুস্থিত, সহায়ক জুতো ব্যবহার করা দলটির শতকরা ৫৮ ভাগ মানুষ হাঁটার সময় হাঁটুর ব্যথা হ্রাসের কথা জানিয়েছেন। তুলনামূলকভাবে সমতল, নমনীয় জুতো ব্যবহারকারী দলটির শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ ব্যথা হ্রাস পাবার কথা জানিয়েছেন। উভয় দলেই নিয়মিত হাঁটার সুফল হিসেবে সম্ভবত ব্যথা হ্রাস পেয়েছে। যারা মজবুত জুতো পরেন তাদের তুলনায় নমনীয় জুতো পরা মানুষদের গোড়ালি বা পায়ের ব্যথার সম্ভাবনা দ্বিগুণ। তাই আপনার হাঁটু ব্যথা থাকলে মজবুত কিন্তু আরামদায়ক জুতো পায়ে হাঁটুন।

Harvard Health Letter, May 2021

হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে পারে ১২ মিনিটের ব্যায়াম

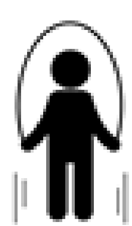

কখনো কি ভেবে দেখেছেন কী পরিমাণ ব্যায়াম-সময় হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে? গত ১৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখে *Circulation* পত্রিকায় প্রকাশিত হার্ভার্ড-এর এক গবেষণা অনুযায়ী এটি ১২ মিনিটের মতো অল্প সময়। গবেষকরা ৪০০-এর অধিক মধ্য বয়স্ক পুরুষ ও মহিলার সাইক্লিং যন্ত্রে ১২ মিনিটের পেডেল মারার পূর্বে ও পেডেল মারার অব্যবহিত পরের রক্ত বিশ্লেষণ করেছেন। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, বিজ্ঞানীরা প্রায় ৬০০ প্রাকৃতিক দৈহিক রাসায়নিক (মেটাবোলাইটস)-এর স্তর গণনা করেন। অধিকাংশ মেটাবোলাইটসে ব্যায়ামের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, একটি মেটাবোলাইটের স্তর হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস ২৯% হ্রাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্য আরেকটি মেটাবোলাইট ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ও যকৃত রোগ ১৮% কমানোর সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু ১২ মিনিটের দৈনিক ব্যায়াম (যাতে তেজস্বি সক্রিয়তা অন্তর্ভুক্ত) যে হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে তার ইঙ্গিত দেয় কিন্তু প্রমাণ করে না। কী ঘটবে যদি আপনি পরিমিত তীব্রতার কিছু অধিক মাত্রার ব্যায়ামবিদ হন? হার্ভার্ড-এর ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও গবেষণা প্রতিবেদনের জ্যেষ্ঠ লেখক ডা. গ্রেগরি লুইস (Gregory Lewis) বলেন, পরিমিত তীব্রতার মাত্রার ব্যায়াম, মেটাবোলাইটের উপর একই ধরনের প্রভাব প্রদর্শন করে কিনা তা আমাদের এখনো অজানা। কিন্তু গবেষণার অংশগ্রহণকারীরা খুব লঘু ব্যায়াম দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং প্রতি মিনিটে তীব্রতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

Harvard Health Letter, February 2021

ফেসবুক বা অন্য কোন অনলাইন সাইট থেকে ক্যান্সার সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণ করবেন না

আজকের দিনে ছেলেবুড়ো সকলের ইন্টারনেটে আসক্তির কথা আর গোপন বিষয় নয়। Facebook, Pinterest, Reddit, Twitter ইত্যাদি সম্পর্কে সবাই কমবেশি জানেন। এসব সাইটে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় তা অনেকে কোনরকম বাছবিচার না-করে সত্য বলে মেনে নেন এবং প্রচারও করেন। কিন্তু বাস্তবতা বলছে এসব সাইটে প্রচারিত ২০০ নিবন্ধের মধ্যে ক্যান্সার বিষয়ক এক-তৃতীয়াংশ তথ্য ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয় বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হয়। এসব ভুল তথ্য অনেকে সত্য বলে মেনে নিয়ে প্রচারও করেন। এর ফলে প্রকৃত ক্যান্সার রোগীরা ভুল চিকিৎসা নেন বা প্রকৃত চিকিৎসার দ্বারস্থ না-হয়ে রোগ আরো জটিল করে তোলেন। তাই যেসব ব্যক্তি ক্যান্সারে আক্রান্ত, তাদের উচিত হবে রোগ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া এবং অনলাইন সাইটে পাওয়া তথ্য নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকৃত তথ্য জেনে নেওয়া।

Journal of National Cancer Institute, 14 July 2021

ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের নিয়মিত কিডনি পরীক্ষা আবশ্যিক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, অথবা উভয় সমস্যায় আক্রান্ত ২৮.৩ মিলিয়ন ব্যক্তি উচ্চ কিডনি রোগের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। কিন্তু এর

মধ্যে মাত্র ২০% ব্যক্তি কিডনি রোগ শনাক্তকরণের জন্য নিয়মিত প্রস্রাব ও রক্ত পরীক্ষা করেন বলে জানা যায়। যদিও মেডিকেল গাইডলাইনে এই দুটি পরীক্ষা নিয়মিত করার কথা বলা হয়েছে।

Diabetes Care, July 2021

ঘুমে শ্বাসবিরতি (Sleep apnea)-এর চিকিৎসা কেন করবেন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮০% হৃদরোগী ঘুমের সময় প্রতিবন্ধিত শ্বাসবিরতি (Obstructive sleep apnea)-তেও ভুগেন। এই সমস্যা সম্পর্কে অনেকে জানেন না বা চিকিৎসকদেরও নজর এড়িয়ে যায়। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য যারা বিশেষ ধরনের যন্ত্রকৌশল (যাকে Continuous positive airway pressure device বলে) ব্যবহার করেন, তাদের মধ্যে এই কৌশল ব্যবহার না-করা ব্যক্তিদের তুলনায় ৩২% কম হৃদআক্রমণ, স্ট্রোক (Stroke) বা হৃদবৈকল্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

Circulation, 21 June 2021 and *Sleep,* 3 May 2021

বুকজ্বালার নতুন ওষুধে উদ্বেগ

বুকজ্বালা (Heartburn)-এর একাধিক ওষুধ টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকির সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ২০৪,৬০৯ জন ব্যক্তির ওপর পরিচালিত এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে। দেখা গেছে যারা এসমোপ্রাজল (বাণিজ্যিক নাম Alton, Nexum, Maxima ইত্যাদি), লানসোপ্রাজল (বাণিজ্যিক নাম Lanso, Lantid, Lanz ইত্যাদি) ও ওমেপ্রাজল (বাণিজ্যিক নাম Seclo, Losectil, Omecare ইত্যাদি) সপ্তাহে অন্তত দু'দিন দুই বছরের অধিক সময় ধরে ব্যবহার করেছেন, তাদের এই ওষুধ ব্যবহার না-করা ব্যক্তিদের তুলনায় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবার ২৬% অধিকতর ঝুঁকি রয়েছে। যারা উক্ত সময়ে একই সাথে ফ্যামোটিডিন (বাণিজ্যিক নাম Fematin, Peptid, Famotin ইত্যাদি) অথবা সিমেটিডিন (বাণিজ্যিক নাম Peptol, Tegamet ইত্যাদি) জাতীয় এইচ-২ ব্লকার ব্যবহার করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি আরো ১৪% বেশি।

Gut, 28 September 2020

চা-পান স্মৃতিভ্রংশের ঝুঁকি হ্রাস করে

জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত চা। শীতের দিনে এক কাপ ধূমায়িত চা আরামদায়ক ও প্রশান্তিদায়ক (Relaxing) মনে হতে পারে। আপনি যদি মাসে ১৯-কাপ ফ্লেভোনয়েড যুক্ত চা পান করেন তাহলে আপনার আলজাইমার ও স্মৃতিভ্রংশ (Dementia)-এর ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পাবে বলে সম্প্রতি *American Journal of Clinical Nutrition* পত্রিকায় প্রকাশিত এক সমীক্ষার ফলাফলে বলা হয়েছে। এর জন্য চা-পাতায় বিদ্যমান ফ্লাভোনয়েড (বিশেষ করে সবুজ চা) প্রদাহরোধী (Anti-inflammatory) বিশেষ ভূমিকা পালন করে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

চা কীভাবে খাবেন তার মধ্যেও অবার ব্যক্তিভেদে পার্থক্য আছে। কেউ সবুজ চা পছন্দ করেন, কারো কাছে আদা-চা বা লেবুর চা পছন্দ। কিন্তু চায়ে বিদ্যমান উপাদানের সুবিধা তাতে ভোগ করতে অসুবিধা নেই।

Prevention, December 2020

ভিটামিন ডি-এর বহুবিধ উপকারিতা

যারা ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার (চর্বিযুক্ত মাছ, ডিম ইত্যাদি) অধিক হারে গ্রহণ করেন, তারা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফল পান। সম্প্রতি গ্রীসে ৩,০৫২ ব্যক্তির ওপর ১০ বছর ধরে পরিচালিত এক সমীক্ষার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যে সকল ব্যক্তি খাবার থেকে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ডি আহরণ করেছেন, তারা খাদ্য থেকে কম ভিটামিন গ্রহণকারীদের তুলনায় উচ্চ রক্তচাপের শিকার হয়েছেন ২০% কম। অন্যদিকে যেসব মহিলা খাবার থেকে অধিক ভিটামিন ডি গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে ৬-২১% উচ্চ রক্তচাপ (High blood pressure), উচ্চ কোলেস্টেরল (High cholesterol)

অথবা উভয় সমস্যা কম দেখা গেছে। উচ্চ ভিটামিন ডি গ্রুপ ভুক্তরা প্রতিদিন ৩.৩ মাইক্রোগ্রাম পরিমাণ ভিটামিন ডি খাবার থেকে গ্রহণ করেছেন। এই পরিমাণ ভিটামিন দুটি ডিম, ক্যানের টুনা মাছ বা ১-আউন্স পরিমাণ স্যামন মাছ থেকে পাওয়া যায়। টুনা ও স্যামন মাছ বাংলাদেশের অভিজাতদের খাবার হলেও আপনি আমাদের দেশের মিঠা পানির রুই, পাংগাস, কাতল বা অন্য মাছ থেকেও ভিটামিন ডি গ্রহণ করতে পারেন।

Journal of Human Nutrition and Dietetics, 7 April 2020

হৃদসমস্যায় কাদের এসপিরিন গ্রহণ করা দরকার?

প্রথম হৃদআক্রমণ (Heart attack) অথবা হৃদসংবহনজাত (Cardiovascular) অন্যান্য সমস্যা ঠেকাবার জন্য ৭৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে ৪৫% বয়স্ক মার্কিন নাগরিক দৈনিক নিম্ন মাত্রার এসপিরিন গ্রহণ করে থাকেন। যদিও উপরোক্ত বয়সে এসপিরিনের এ ধরনের ব্যবহার সুপারিশ করা হয় না। তাই আপনার হৃদপিণ্ডে কোন সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। তিনিই সর্বোত্তম ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেবেন।

Journal of the American Geriatrics Society
17 February 2021 Online

হাসপাতালে রোগী দেখতে গেলে হাত ধোয়ার অভ্যাস করুন

আপনি কি কোন অসুখ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি? তাহলে আপনার কোনো স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা হাসপাতাল কর্মীদের কেউ আপনাকে দেখতে কক্ষে প্রবেশের পরই তাদেরকে হাত ধুয়ে নিতে বলবেন। শিকাগো বিশ্ববিধ্যালয়েন মেডিকেল সেন্টারের গবেষকরা দেখেছেন – কোভিড-১৯ এর সূচনাপর্বে হাসপাতাল কর্মীদের ৯০-১০০% হাত ধুয়ে নিতেন, কিন্তু এখন সেটা ৫২%-এ নেমে এসেছে।

JAMA Internal Medicine, 26 April 2021 Online

মাশরুম ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে

আপনি যদি প্রতিদিন স্বল্প পরিমাণে মাশরুম গ্রহণ করেন তাহলে সেটি মাশরুম না-খাওয়া ব্যক্তিদের তুলনায় আপনার ক্যান্সারের ঝুঁকি ৪৫% হ্রাস করতে পারে। সম্প্রতি ১৯,৯৩২ জন ব্যক্তির ওপর পরিচালিত ১৭টি সমীক্ষা পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা এই তথ্য পেয়েছেন। এতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অধিকাংশ ছিলেন এশিয়ার অধিবাসী। গবেষকরা দেখেছেন মাশরুম সেবনকারীদের ক্যান্সারের এই নিম্নহার বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তার মধ্যে স্তন ক্যান্সার অন্যতম। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, মাশরুমে বিদ্যমান ভিটামিন ও জারকরোধী (Antioxidant) কোষকে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী জিনগত ক্ষতি (Genetic damage) হওয়া থেকে সুরক্ষা দেয়।

বিশেষ করে জানা দরকার যে, মাশরুম এর্গোথিওনেইন (Ergotheoneine) নামক জারকরোধী (Antioxidant)-এর একটি সমৃদ্ধ উৎস। এ ধরনের জারকরোধী বিপুল হারে Shilitake, oyster, malitake এবং king oyster মাশরুমে পাওয়া যায়। তাই মাশরুমকে অবহেলা না-করে আপনার নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে উপকৃত হবেন।

Advances in Nutrition, 16 March 2021 Online

ভিটামিন বি-১২ এবং পাকস্থলির এসিড

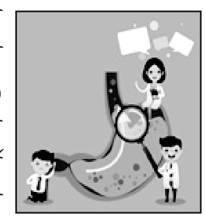

খুব সীমিত পরিমাণে পাকস্থলির এসিড-এর কারণে ভিটামিন বি১২-এর ঘাটতি (Deficiency) দেখা দেয় যা স্মৃতিভ্রংশ (Dementia)-এর কারণ হতে পারে। গবেষকরা ষাটোর্ধ বয়সের ৩,৩০০ ব্যক্তির ভিটামিন বি-১২-এর মাত্রা মেপে দেখেছেন। এদের মধ্যে প্রায় ৩৭% ব্যক্তি পাকস্থলির এসিডের হার কমানোর জন্য প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর্স (PPI) ব্যবহার করছিলেন। অন্য ১৫% ব্যক্তির অপুষ্ট জঠরপ্রদাহের (Atropic gastritis - প্রদাহের কারণে পাকস্থলির লাইনিং পাতলা হয়ে যাওয়া) জন্য পাকস্থলির এসিডের উৎপাদন ছিল সীমিত।

নিম্নমাত্রায় বি-১২ ভিটামিন থাকা প্রকৃত ঘাটতি না হলেও ৩৮% ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপুষ্ট জঠরপ্রদাহ (Atropic gastritis) পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ২১% ছিলেন পিপিআই (PPI) ব্যবহারকারী এবং ১৫% ভিন্ন উপাদান ব্যবহারকারী।

আপনার করণীয় : আপনার বয়স কি পঞ্চাশোর্ধ? অপুষ্ট জঠরপ্রদাহ (Atropic gastritis) সাধারণভাবে যেহেতু বয়স্কদের ভেতর দেখা দেয় এবং অধিকাংশই এর উপস্থিতি সম্পর্কে বুঝতে পারেন না, সেজন্য চিকিৎসকের পরামর্শে প্রতিদিন ২.৪ মাইক্রোগ্রাম সম্পূরক ভিটামিন বি-১২ গ্রহণ করতে পারেন। সম্পূরক জাতীয় ভিটামিন বি-১২, প্রাকৃতিকভাবে মাংস, ডেয়ারিজাত খাবার ও ডিমে প্রাপ্ত ভিটামিনের মত পাকস্থলির এসিড ছাড়াই শোষণ করতে পারবে।

Nutrition Action Health Letter, September 2021

নবীন চিকিৎসকগণ নিজের জ্ঞান পরীক্ষা করুন

কণ্ঠগ্রাস বা একিউট ডিসফাজিয়া (Acute dysphagia)-এর সূত্রপাত ও খাওয়ার পর ঘাড়ে ব্যথা
Acute onset dysphagia and neck pain after eating

একজন ৪০ বছর বয়সের মহিলা গলাধঃকরণে অসুবিধা ও গলার অধি উরোস্থি খাঁজ (Suprasternal notch)-এ অস্বস্তি নিয়ে সন্ধ্যায় জরুরি বিভাগের শরণাপন্ন হলেন। নৈশভোজে মাংস খাবার সময় তার উপসর্গগুলো (Symptoms) শুরু হয়েছিল। তিনি লালা গিলতে সমর্থ ছিলেন এবং মুখ দিয়ে লালা পড়ত না। কিন্তু অন্য কোন ধরনের তরল গলাধঃকরণের যেকোন রকম চেষ্টায় মারাত্মক ব্যথার সম্মুখীন হতেন এবং তাৎক্ষণিক খাদ্য বের হয়ে আসত। তার বায়ুপথ (Airways) যাচাই করে ঠিকঠাক পাওয়া গেলো। তিনি পূর্ণাঙ্গ বাক্য বলতে সক্ষম এবং কণ্ঠস্বরে কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি ও তা বোধগম্য ছিল। তার মধ্যে কোন শ্বাসনাদ (Stridor – ঝড়ো হাওয়ার মত সশব্দ শ্বাসপ্রশ্বাস)-এর মতো শব্দ হতো না এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কোন জটিলতাও ছিল না। ভর্তির সময় ভদ্রমহিলার মাঝে নিচের পর্যবেক্ষণগুলো পাওয়া যায় :

- তাপমাত্রা/Temperature: ৩৭.২ সে.
- রক্তচাপ/Blood pressure: ১৩১/৮৫ মিমি পারদ চাপ
- স্পন্দন হার/Pulse rate: ৯৭ স্পন্দন/মিনিট
- শ্বসন হার/Respiratory rate: ১৭ দম/মিনিট
- স্পন্দন অক্সিমেট্রি/Pulse oximetry: কক্ষ বাতাসে ৯৯%

রোগীর ঘাড় ও মুখগহ্বর পরীক্ষা করে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু দেখা যায়নি। এছাড়া রোগী সুস্থ ও ভালো ছিলেন। মহিলার গলাধঃকরণ সংক্রান্ত জটিলতার কোন ইতিহাস ছিল না। একটি সাধারণ রেডিওগ্রাফ ফিল্ম গ্রহণ করে দেখা গেছে, সি ৬/৭ কশেরুকা (C6/7 vertebrea)-এর দিকে নিকটস্থ খাদ্যনালি (Proximal oesophagus)-এর অভ্যন্তরে বেতার তরঙ্গ ঘনত্বের অস্বচ্ছতা (ছবি দেখুন)।

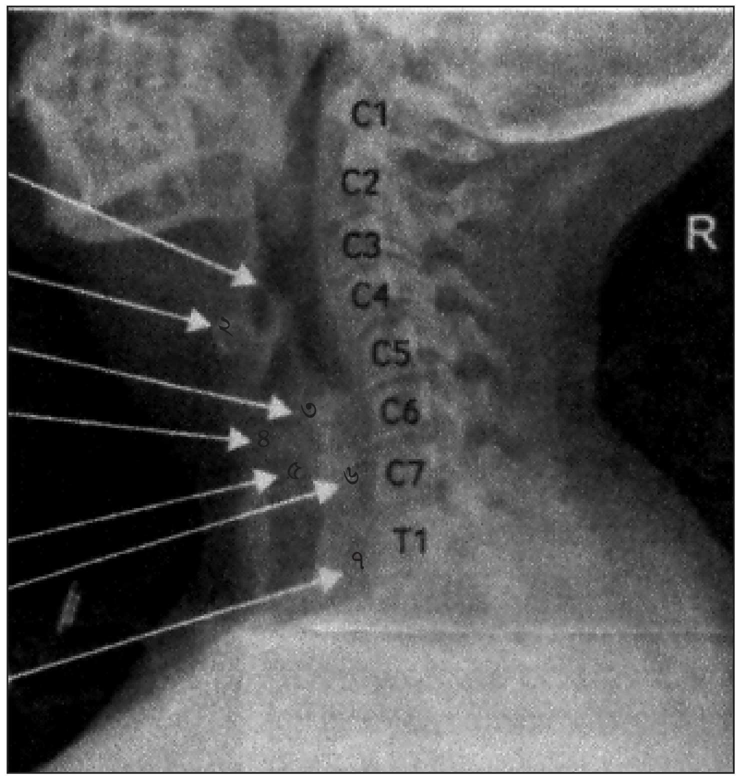

১. উপজিহ্বা ২. জিহ্বামূলাস্থি ৩. কল সোপাস্থি উপাস্থি ৪. বৃত্তাকার কোমলাস্থি ৫. শ্বাসনালী ৬. তেজস্ক্রিয় ঘন অনচ্ছতা ৭. খাদ্যনালিতে গ্যাসের বুদবুদ

পাঠকের কাছে প্রশ্ন

১. সম্ভাব্য রোগ নিরুপণ কী হবে?

২. এই অবস্থাটিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন?

৩. এই বয়সের রোগীর ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আর কী কী অনুসন্ধান প্রয়োজন হতে পারে?

British Medical Journal, 20 March 2021

সঠিক উত্তর ৪৬ নম্বর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

খরগোশের দৌড়

আরিফ মাহমুদ
আটলান্টা, জর্জিয়া (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) থেকে

কখনো তৃণভূমে, কখনো পাহাড়ি উঁচু-নীচু পথে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত খরগোশ। বৃক্ষ বলে : কী হয়েছে তোমার? এতো অধীরতা কীসের? কেন তোমার এই পেরেশানি।

আর বলো না। কচ্ছপের সাথে দৌড়ে হেরে গিয়েছিলো আমার কোনো এক পূর্বসূরি। কী আজব ব্যাপার বলো! সেই গল্প এখনো মানুষের মুখে ফিরে। এটা মেনে নেয়া যায় না।

তাতে কী হয়েছে?

সেই হারানো রেস আবার শুরু করেছি।

কেন?

কারণ এবার আমি বিজয়ী হতে চাই।

কেন বিজয়ী হতে চাও?

কারণ জঙ্গলের সবাইকে দেখিয়ে দিতে চাই – আমিই দ্রুতগামী। আমিই প্রথম। আসলে আমিই সেরা।

তাতে কী হবে?

একটা মেডেল পাবো।

মেডেল পেলে কী হবে?

স্ট্যাটাস বাড়বে।

তাতে কী হবে?

স্ট্যাটাস বাড়লে সম্মান বাড়বে। আয় বাড়বে। আয় বাড়লে বেশি বেশি খাবারও জুটবে।

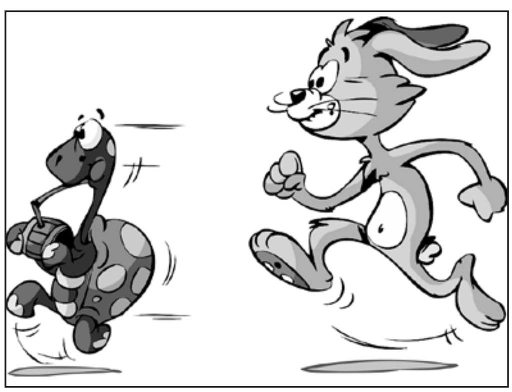

বৃক্ষ সবুজ উপত্যকাটা দেখিয়ে বলে : তোমার জন্য ওখানে অনেক খাবার পড়ে আছে। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ঝরণায় জল আছে।

তাতে কী। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুতগামী খরগোশ হিসাবে ইতিহাসে আমি স্মরণীয় হতে চাই।

আজ থেকে হাজার বছর আগে সবচেয়ে দ্রুতগামী হরিণের নাম, সবচেয়ে দ্রুতগামী বাঘের নাম, সবচেয়ে দ্রুতগামী হাতির নামটা কেউ স্মরণ করতে পারে?

না, পারে না।

আজকে তোমাকে কচ্ছপ চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। কালকে তোমাকে সাপ চ্যালেঞ্জ জানাবে। পরশু তোমাকে হরিণ চ্যালেঞ্জ করবে। তুমি কতজনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে। তুমি কতজনের সাথে রেসে দৌড়াবে। আর কতগুলো রেসে তুমি জিততে পারবে? তোমার জন্মই কি হয়েছে শুধু রেসে জেতার জন্য। এই রেসে দৌড়াতে দৌড়াতে তোমার গোটা জীবন চলে যাবে। বিনিময়ে জঙ্গলের সবাইর কাছ থেকে শুধু একটা মেডেল আর বাহ্‌বা পাবে। এই রেসটাই কি তোমার জীবন?

আমি তো এভাবে ভেবে দেখিনি।

না দেখারই কথা। কারণ একটা রেসের মধ্যে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত রাখাতে পারাটাই যে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই ছুটছে। সবাই একটা রেসের ঘোড়া হয়ে দৌড়াচ্ছে। কার আগে কে যাবে। কার আগে কে গন্তব্যে পৌঁছাবে। কে সবচেয়ে সেরা – কার আগে কে এটা প্রমাণ করবে। কেউ বিশাল বাড়ি বানিয়ে প্রমাণ করছে আমিই সেরা। কেউ দামী গাড়ি কিনে প্রমাণ করছে আমি সেরা। কেউ মেডেল পেয়ে বলছে আমিই সেরা।

বৃক্ষ খরগোশকে বলে : আমার ছায়ায় একটু বসো। তোমাকে একজনের গল্প বলি। তার নাম আলেকজান্ডার। সবাই তাকে 'আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট' নামে চেনে। এই বলে বৃক্ষ তার গল্প বলা শুরু করলো :

আলেকজান্ডার অনেক দেশ জয় করে ছুটতে ছুটতে ভারত পর্যন্ত এসেছে। সেখানে এক ঋষির সাথে তার দেখা।

ঋষি বলেন – এতো ছুটছো কেন?

সময় নেই। দাঁড়াবার সময় নেই। যত দ্রুত পারি ভারত জয় করতে হবে।

তারপর কী হবে?

তারপর চীন জয় করবো।

তারপর?

তারপর বিশ্রাম নিবো। তা আপনি কী করছেন?

ঋষি হেসে বলেন : আমি তো বিশ্রামই নিচ্ছি।

জানো খরগোশ ভায়া, গ্রেট হতে গিয়ে আলেকজান্ডার এতো বেশি ছুটেছে – শুধু বিশ্রামটুকুই পায়নি। বিশ্রাম নেয়ার সময় পাওয়ার আগেই সময় তাকে তুলে নিয়ে গেছে। আরেকজন হলেন নেপোলিয়ান। তিনি বলেছেন : পাঁচ মহাদেশকে হয়তো পায়ের নীচে রাখতে পারি। কিন্তু শুধু একটা রাত নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারিনি। চোখে যখনই ঘুম আসে তখনই মনে হয় – এই বুঝি রাজ্যটা অন্যের হস্তগত হলো।

একেকজনের একেক রেস। কারো যুদ্ধ জয়ের

রেস। কারো রাজ্য বাড়ানোর রেস। কারো সবচেয়ে ধনী হবার রেস। কারো জনপ্রিয় হবার রেস। কারো চিরদিন ক্ষমতায় টিকে থাকার রেস। এই রেসের মাঝেই সময় তার হুইসেল বাজিয়ে দেয়। টেনে দেয় এমন এক যতির চিহ্ন – এরপর দুনিয়ার সব রেসের ঘোড়া এক করেও কেউ আর এক কদম সামনে এগোতে পারে না। তোমাকে এক কবির কথা বলি শুনো। কবির নাম হলো বব মার্লি। বব মার্লির কবিতার একটা বিখ্যাত লাইন : যেই মুহূর্তে তুমি রেস থেকে নিজেকে দূরে রেখেছো – সেই মুহূর্তেই তুমি পৃথিবীর সেরা রেসে বিজয়ী হয়ে গেছো।

বাহঃ চমৎকার কথা তো!

তা, এখন তুমি কী করতে চাও?

আমি বটের ছায়ার নীচে বিশ্রাম নিতে চাই। ঝরণা পাড়ে গিয়ে একটু খেলতে চাই। মলয়নিলয়ে একটু আস্বাদিত হতে চাই। এই রেস বিজয়ের উন্মাদনা থেকে দূরে থাকতে চাই।

সেটা তুমি চাইলে এই মুহূর্তেই পারো।

খরগোশ একটা ঝরণার ধারে যায়। গিয়ে দেখে প্রজাপতি ওড়ছে, মৌমাছি গুঞ্জরণ করছে, বাতাসের সন্তরণ হচ্ছে, সমীরণ বইছে, ঘুঘু ডাকছে, দুটো পাখি ঝরণার জলে স্নান করছে, বনের ফুলগুলো দুলছে।

তারা অবাক হয়ে খরগোশকে দেখে বলে : কী ব্যাপার। তোমার না আজ কচ্ছপের সাথে রেস ছিল? রেসে না গিয়ে তুমি এখানে কী করছো।

খরগোশ বলে : এসব বৃথা। বড়ই অর্থহীন। জীবনে এই মুহূর্তটাই আসল। প্রতিটি মুহূর্তের যোগফলটাই জীবন। আর এই ছোট এই জীবনে শুধু রেসের মাঠে দৌড়ে দৌড়ে জীবনটা শেষ করতে চাই না। কে বাহ্বা দিলো, কে বাহ্বা দিলো না – তাতেও আমার আর কিছুই আসে যায় না।

কেউ যে তোমাকে কোনো মেডেল দিবে না।

তাতে কিবা আসে যায়। কোন আম গাছ কবে প্রথম মিষ্ট ফল দিয়েছিলো তার জন্য সে কি কোনো মেডেল পেয়েছিলো? মেডেল না পেলেও তার কিছু আসে যায় না। তার কথা কেউ মনে রাখলে কিংবা না রাখলেও তার কিছুই আসে যায় না।

কিন্তু সবাই যে বলবে খরগোশ হেরে গিয়েছিলো।

হ্যাঁ, সেটা বলবে। কিন্তু হয়তো এই গল্পটিও একজন আরেকজনের কাছে পৌঁছে দিয়ে বলবে – একটা খরগোশ ছিল যে রেসে জিততে পারেনি। কিন্তু জীবনে জিতে গেছে। সে মেডেল পায়নি। কিন্তু সে তার জীবনটাই ফিরে পেয়েছে।

▲গণস্বাস্থ্য

গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ (GPL)-এর এনেসথেসিয়ার ওষুধসমূহ

ওষুধের নাম (ব্র্যান্ডেড জিনেরিক)		ভ্যাটসহ GPL ওষুধের MRP
১	২	৩
জি-কেটামিন আইএম/আইভি ইন. ৫০০ মিঃগ্রাঃ/১০ মিলি	G-Ketamine IM/IV Inj. 500 mg/10 ml	৯৭.০০ টাকা/ভায়াল
জি-থায়োপেন্টাল ৫০০ মিঃগ্রাঃ আইভি ইন.	G-Thiopental 500 mg IV Injection	৬০.০০ টাকা/ভায়াল
জি-থায়োপেন্টাল ১ গ্রাম আইভি ইন.	G-Thiopental 1 gm IV Inj.	১০০.০০ টাকা/ভায়াল
জি-নিওস্টিগমিন ইন. ০.৫ মিঃগ্রাঃ/১মিলি	G-Neostigmine Inj. 0.5 mg/1 ml	১০.০০ টাকা/এম্পুল
জি-লিডোকেইন ইন. ২% ৫০ মিঃলিঃ প্লেইন	G-Lidocaine Inj. 2%, 50 ml	২৫.০০ টাকা/ভায়াল
জি-লিডোকেইন ইন. ২% ৫০ মিঃলিঃ এড্রিনালিনসহ	G-Lidocaine Inj. 2%, 50 ml with Adrenaline	৫৭.০০ টাকা/ভায়াল
জি-ইফিড্রিন ইন. ২৫ মিঃগ্রাঃ/৫ মিলি	G-Ephedrine Inj. 25 mg/5 ml	২৫.০০ টাকা/এম্পুল
জি-বুপিভাকেইন হেভী ইন., ৪ মিলি	G-Bupivacaine Heavy Inj., 4 ml	৩০.০০ টাকা/এম্পুল
জি-সাক্সামিথোনিয়াম ইন. আইএম/আইভি ১০০ মিঃগ্রাঃ/২ মিলি	G-Suxamethonium IM/IV Inj. 100 mg/2 ml	১৭.২৫ টাকা/এম্পুল

দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে

গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিমিটেড
মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টঃ, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪, বাংলাদেশ

ফ্যাট নিয়ে বিভ্রান্তি : তেল-চর্বির ভালো-মন্দ

আরাফাত রহমান
ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, রিভারসাইড-এ পিএইচ.ডি শিক্ষার্থী

ট্রান্সফ্যাট থেকে দূরে থাকুন, সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট কমিয়ে বহু অসম্পৃক্ত বা পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ব্যবহার করুন।

টিউটোরিয়াল : বায়োইনফরমেটিক্স প্রজেক্টে কীভাবে ভাবতে হয়

এক সময় বলা হতো সকল তেল-চর্বিই খারাপ। তবে আজকাল শোনা যাচ্ছে, তেল-চর্বির মধ্যেও ভালোমন্দ আছে। এখন আমরা জানি, ট্রান্স ফ্যাট স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। বিপরীতে পলিআনস্যাচুরেটেড এবং মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট শরীরের জন্য ভালো। অন্যদিকে, স্যাচুরেটেড ফ্যাট ভালোমন্দের মাঝামাঝি।

বহুদিন ধরেই পুষ্টিবিদ আর চিকিৎসকরা আমাদের খাদ্যতালিকায় তেল-চর্বি বাদ দেয়ার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু দেখা গেলো, খাবার থেকে তেল-চর্বি বাদ দিয়ে দিলে তা আমাদের ভালো স্বাস্থ্য দেয় এমনটা নয়। এর কারণ হলো 'খারাপ' ফ্যাট বাদ দিতে গিয়ে আমরা 'ভালো' ফ্যাটও বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু ট্রান্সফ্যাট (Trans fat), পলিআনস্যাচুরেটেড বা মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এইসব গোলমেলে শব্দ দিয়ে ঠাসা ডায়েট-বিষয়ক কথাবার্তা আমাদের বিভ্রান্ত করে ফেলে। এ বিষয়ক বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্যই আজকের এই লেখাটি।

তেল-চর্বির বিরুদ্ধে এত দীর্ঘদিন ধরে সরলীকৃত প্রচারণা চলেছে যে 'তেল-চর্বি খারাপ' এ ধারণাটা আমাদের মধ্যে বেশ পাকাপোক্তভাবে গেড়ে বসেছে। **আমাদের দেহের কিন্তু কিছু পরিমাণে তেল-চর্বি দরকার হয়। ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় পদার্থ শক্তি তৈরির অন্যতম উৎস। কিছু কিছু ভিটামিন এবং জরুরি খনিজ-পুষ্টি শোষণের জন্য স্নেহপদার্থ সাহায্য করে থাকে।** সকল কোষের কোষঝিল্লী তৈরিতে ফ্যাট দরকার হয়, যা কোষের অতিজরুরি বহিরাবরণ। স্নায়ুর 'শেথ' আবরণ তৈরিতেও দরকার স্নেহপদার্থ। রক্ত জমাটবাঁধা, পেশির নড়াচড়া এবং প্রদাহের ক্ষেত্রেও দরকার স্নেহপদার্থের।

তবে দীর্ঘ সুস্বাস্থ্যের জন্য কিছু স্নেহ পদার্থ অন্যগুলোর চাইতে ভালো। ভালো ফ্যাটের মধ্যে আছে মনো-আনস্যাচুরেটেড ও পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট। শিল্পজাত ট্রান্সফ্যাট হলো সবচেয়ে খারাপ। স্যাচুরেটেড ফ্যাট এই দুইয়ের মাঝামাঝি বলা যায়। কিন্তু এসব ফ্যাটের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হলে আমাদের জানা প্রয়োজন রাসায়নিকভাবে এরা দেখতে কেমন।

আসলে সকল ফ্যাটের রাসায়নিক গঠন মোটাদাগে একই রকম। এরা মূলত কার্বন পরমাণুর একটি দীর্ঘ চেইন বা শৃঙ্খল যারা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকে। এদের মধ্যে পার্থক্য হয় মূলত একেকটি কার্বন শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য, আকৃতি ও কার্বন-পরমাণুতে যুক্ত হাইড্রোজেনের সংখ্যায়। নবীন চোখে এসব পার্থক্য হয়তো সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞ ঠিকই জানেন যে রসায়নের এই সামান্য গাঠনিক পার্থক্য ফ্যাট অণুর আকৃতি ও কাজে বিশাল বড় পার্থক্য এনে দিতে পারে।

'মন্দ' ট্রান্স ফ্যাট

ট্রান্সফ্যাট হলো সবচেয়ে বাজে। হাইড্রোজেনেশন নামক একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ট্রান্সফ্যাট তৈরি হয়। স্বাস্থ্যকর তেল জাতীয় পদার্থকে কঠিন পদার্থে পরিণত করে গন্ধ তৈরি হওয়া বন্ধ করতে হাইড্রোজেনেশন ব্যবহার করা হতো। ট্রান্সফ্যাটের তো কোন পুষ্টিগুণ নেই, পাশাপাশি নিরাপদ কোন ভোজ্যমাত্রাও নেই। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশে ট্রান্সফ্যাট এখনো নিষিদ্ধ নয়। ডালডা বা বনস্পতি ঘি এবং তা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন খাবার, ফাস্টফুড ও বেকারি পণ্যে ট্রান্সফ্যাট থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, **বিশ্বে ট্রান্সফ্যাটজনিত হৃদরোগে মৃত্যুর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ঘটে ১৫টি দেশে, যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে ট্রান্সফ্যাট (Trans fat) নয় এমন তেল প্রায়ই বারবার রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া দোকান থেকে জিলাপি-চপ ইত্যাদি ডোবা-তেলে ভাজা হয় যা প্রায় সবসময়ই একাধিকবার ব্যবহৃত হয়। পুনরায় ব্যবহার করলে তেলে থাকা দ্বিবন্ধনি ভেঙে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে ট্রান্সফ্যাটে পরিণত হয়। এর ফলে স্বাস্থ্যকর তেলও ক্ষতিকর ট্রান্সফ্যাটে পরিণত হয়ে নীরব ঘাতকে পরিণত হয়।**

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কৃত্রিম মাখন (মার্জারিন) ও সবজিজাত তেল কঠিন পদার্থে পরিণত করে সংরক্ষণ করার জন্যে ব্যবহৃত হতো। এরপর বেশ দ্রুতই আমেরিকার বিভিন্ন শিল্পজাত খাবারে আংশিক হাইড্রোজেনেটেড সবজিজাত তেলের ব্যবহার বাড়তে থাকে। বিস্কুট, পেস্ট্রি থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই সব

ক্ষেত্রেই এদের দেখা পাওয়া শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ আরো অন্যান্য দেশেই এখন ট্রান্সফ্যাট নিষিদ্ধ।

যেসব খাবারে ট্রান্সফ্যাট বেশি আছে, সেগুলো রক্তে ক্ষতিকর LDL-যুক্ত কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বিপরীতে স্বাস্থ্যকর HDL-যুক্ত কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে যায়। ট্রান্স ফ্যাটের ফলে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ তৈরি হয়। **ট্রান্সফ্যাটের সাথে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিসসহ অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধির ঝুঁকি বাড়ে। আগেই বলেছি যে ট্রান্সফ্যাটের কোন নিরাপদ ভোজ্যমাত্রা নেই। খুব অল্প পরিমাণ ট্রান্সফ্যাটও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে।** এমনকি দৈনিক মোট ক্যালরির ২%-ও যদি ট্রান্সফ্যাট থেকে আসে, তা হৃদরোগের ঝুঁকি ২৩% পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়।

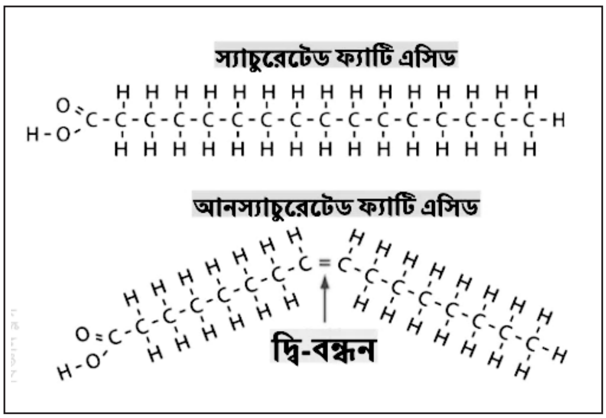

সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের মধ্যে পার্থক্য।

'মাঝামাঝি' স্যাচুরেটেড ফ্যাট

স্যাচুরেটেড ফ্যাটও সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থ। যেমন ধরুন ঘি, লাল মাংসে থাকা চর্বি, পনির, নারকেলের তেল ইত্যাদি। এছাড়া কেকের ক্রিম সহ বিভিন্ন দোকানজাত বেকারি পণ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। কিন্তু স্যাচুরেটেড ফ্যাট আসলে কী?

স্যাচুরেটেড বলতে আসলে কার্বনে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুর কথা বোঝানো হচ্ছে। কার্বন পরমাণু সর্বোচ্চ সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত অর্থাৎ সম্পৃক্ত (স্যাচুরেটেড)।

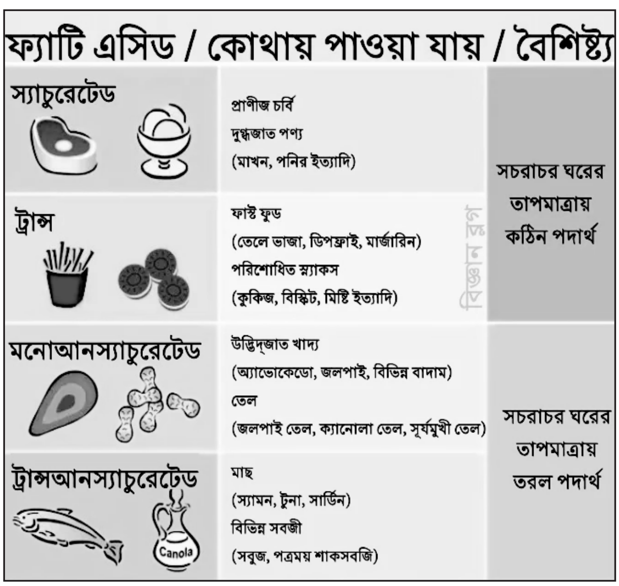

কিন্তু স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত ফ্যাট কি আপনার জন্য ভালো? **খাদ্যতালিকায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি থাকলে তা মোট কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, যা কিনা খারাপ LDL-যুক্ত কোলেস্টেরলের পরিমাণও বাড়িয়ে দেবে। ফলাফলে তা হৃৎপিন্ডে বা দেহের অন্যান্য ধমনীতে ব্লকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে।** এই কারণে অধিকাংশ পুষ্টিবিদ দৈনিক স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ মোট ক্যালরির ১০%-এর নিচে রাখতে বলেন।

বেশ কিছু গবেষণায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট ও হৃদরোগের মধ্যে সম্পর্ক আসলে কি, সে জল ঘোলা করেছে। যেমন একটি মেটা-এনালাইসিস (যা ২১টি অন্যান্য পরীক্ষামূলক গবেষণার ভিত্তিতে করা) বলছে যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়ায় – এই উপসংহার দেয়ার মতো যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের স্থানে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ব্যবহার করলে তা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

আরো দুটি গবেষণায় এ রকম উপসংহার পাওয়া গেছে। স্যাচুরেটেড ফ্যাটের স্থানে সবজি-তেলের মতো পলিআনস্যাচুরেডেট ফ্যাট বা ফাইবার সমৃদ্ধ শর্করা খেলে তা হৃদরোগের ঝুঁকি সবচেয়ে কমাবে। অন্যদিকে স্যাচুরেটেড ফ্যাটকে প্রক্রিয়াজাত শর্করা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করলে তা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

'ভালো' মনোআনস্যাচুরেটেড ও পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট

সবজি, বাদাম, বীজ ও মাছ থেকে মূলত ভালো ফ্যাট আসে। স্যাচুরেটেড ফ্যাট থেকে এদের মূল পার্থক্য হলো কার্বন শেকলে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে। এসব ফ্যাট ঘরের তাপমাত্রায় তরল। এদেরকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : মনোআনস্যাচুরেটেড ও পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট।

যখন ইতালিয়ান রেস্তোরাঁয় আপনি জলপাই তেলে চুবিয়ে রুটি খাচ্ছেন, তখন আসলে আপনি মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটই খাচ্ছেন। মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটে একটা মাত্র কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে। ফলে এখানে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু কম থাকে। এই রাসায়নিক গঠনের কারণে ঘরের তাপমাত্রায় মনোআন-স্যাচুরেটেড ফ্যাট তরল হয়ে থাকে।

মনোআনস্যাচুরেটেড তেলের জন্য ভালো উৎস হলো জলপাই তেল, বাদামের তেল, ক্যানোলা তেল, অ্যাভোকাডো, অধিকাংশ বাদাম ও উচ্চ-অলেয়িক কুসুম ফুলের তেল ও সূর্যমুখী তেল।

মনোআনস্যাচুরেটেড তেল যে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হতে পারে, তা ১৯৬০-এর দশকে সাতটি দেশে করা গবেষণা থেকে উঠে আসে। দেখা যায়, গ্রিস ও অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে

মানুষের খাবারে তেলের পরিমাণ বেশি থাকলেও তাদের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার হার অত্যন্ত কম। তবে তাদের খাদ্যে ফ্যাটের মূল উৎস কিন্তু অন্যান্য দেশের মতো (হৃদরোগের উচ্চহার যেসব দেশে) সম্পৃক্ত প্রাণীজ চর্বি নয় বরং জলপাই তেল। জলপাই তেল মূলত মনোআনস্যাচুরেটেড তেল। এই ফলাফল পরবর্তীতে জলপাই তেল সংবলিত খাবারে আগ্রহ বাড়িয়ে দেয় – যা মেডিটেরিয়ান ডায়েট ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্য নামে পরিচিত।

ইনস্টিটিউট অব মেডিসিনের পরামর্শ অনুযায়ী স্যাচুরেটেড ও ট্রান্সফ্যাট খাবার থেকে বাদ দিতে যথাসম্ভব মনো ও পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ব্যবহার করা উচিত।

রান্নার প্যানে আমরা যে-তেল ব্যবহার করি তা অধিকাংশ সময়েই পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট। কর্ন তেল, সূর্যমুখি, কুসুম তেল হলো সাধারণ উদাহরণ। পলিআনস্যাচুরেটেড এসেনশিয়াল বা প্রয়োজনীয় ফ্যাট। তার মানে, আমাদের শরীর এগুলো তৈরি করতে পারে না, যদিও কোষীয়-কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য এগুলো জরুরি। অর্থাৎ এগুলো অবশ্যই খাবার থেকে পেতে হবে। পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট কোষঝিল্লী ও স্নায়ুর আবরণ তৈরির জন্য দরকার। এছাড়া রক্ত জমাটবাঁধা, পেশি নড়াচড়া আর প্রদাহের জন্য দরকার হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, সরিষার তেলও পলিআনস্যাচুরেটেড তেলের উদাহরণ। বহুদিন ধরে প্রচলিত আছে যে এতে থাকা ইরুসিক এসিডের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, যার কারণে এটি অনেক দেশে নিষিদ্ধ। কিন্তু এটি অনেক পুরনো গবেষণার ফলাফল। যা সম্ভবত প্রচুর পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে ইরুসিক এসিডের কোন ভূমিকা নেই। সরিষার তেল শুধুমাত্র কাঁচা অবস্থায় থাইরয়েড বৈকল্য-এ আক্রান্ত রোগীদের জন্য নিষিদ্ধ। বাকি সবাই এই তেল খেতে পারে

পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটের কার্বন শেকলে দুই বা ততোধিক দ্বিবন্ধনী থাকে। দুই ধরনের পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট রয়েছে : ওমেগা-৩ ও ওমেগা-৬। এই ৩ বা ৬ সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয় প্রথম কার্বন থেকে কতগুলো কার্বন পরে থেকে প্রথম দ্বিবন্ধনীর দেখা মেলে।

স্যাচুরেটেড তেল-চর্বি আর পরিশোধিত শর্করা (যেগুলো ফাস্টফুডে বেশি থাকে) বাদ দিয়ে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ ফ্যাট খেলে তা ক্ষতিকর LDL-যুক্ত কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

স্বাস্থ্যকর ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের ভালো উৎস হলো মাছের তেল। যেমন স্যামন, ম্যাকারেল, সার্ডিনে ওমেগা-৩ ফ্যাট বেশ ভালো পরিমাণে থাকে। এছাড়া ফ্ল্যাক্স, ওয়ালনাট, ক্যানোলাতেল, ও হাইড্রোজেনেটেড নয় এমন সয়াবিন তেলও এর ভালো উৎস। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা সাধারণত একই তেল বারবার ব্যবহার করে থাকি রান্নার কাজে। ফলে অসম্পৃক্ত তেলও দ্বিবন্ধনী ভেঙ্গে হাইড্রোজেনেটেড হয়ে পড়ে – যা অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড হৃদরোগ ও স্ট্রোক প্রতিরোধ এমনকি চিকিৎসার জন্যেও সাহায্য করে। রক্তচাপ কমানো, HDL-যুক্ত বা ভালো কোলেস্টেরল বাড়ানো, ট্রাইগ্লিসারাইড কমানোর সাথে সাথে হৃদপিন্ডে ঘাতক হৃদস্পন্দন তৈরি হওয়া ঠেকাতে পারে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট। গবেষণায় দেখা গেছে, গেঁটেবাত বা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস রোগীদের কর্টিকোস্টেরয়েড জাতীয় ওষুধের পরিমাণও কম প্রয়োজন হতে পারে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড ডায়েটে থাকলে। এছাড়া ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের অন্যান্য স্বাস্থ্যকর দিক থাকতে পারে যেগুলো নিয়ে এখনো গবেষণা চলমান।

ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিডও হৃদরোগের বিরুদ্ধে উপকারী। যেসব খাবারে লিনোলেইক এসিড ও অন্যান্য ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড আছে তাদের মধ্যে কুসুম, সয়াবিন, সূর্যমুখী, ওয়ালনাট ও কর্নতেল উল্লেখযোগ্য।

▲গণস্বাস্থ্য

তথ্যসূত্র :

হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং : *The truth about fats: the good, the bad, and the in-between*
বিডিনিউজ২৪ : *তেল পুনরায় ব্যবহারে ঝুঁকি*
বাংলানিউজ২৪ : *খাদ্যে ট্রান্স ফ্যাটি*

লেখাটির ফ্যাক্টচেক করে দিয়েছেন সৃজনী মণ্ডল। তিনি কলেজ অব হোম ইকনমিকসে পুষ্টিবিজ্ঞানের স্নাতক শিক্ষার্থী।

[বি:দ্র: এটা কোন ডায়েটচার্ট নয় বা রোগীদের জন্য সুপারিশ নয়। আদর্শ ডায়েটচার্ট বা ওষুধপথ্য সুপারিশের জন্য ডাক্তার বা পুষ্টিবিদদের সাথে যোগাযোগ করুন।]

পৃথিবী, পরিবেশ, মানুষ ও খাদ্য

কদবেলে স্বাস্থ্য

বাজারে উঠছে কদবেল। বিভিন্ন জায়গায় কিছুদিনের মধ্যে এই বেল মাখাও পাওয়া যাবে। সাধারণত আগস্ট থেকে নভেম্বর মাসে এই ফল পাকে। পাকা কদবেলে রয়েছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা, ফ্যাট ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি ও সি। প্রতি ১০০ গ্রাম মন্ডে ৪৯ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায় কদবেল থেকে। দেশি এই ফল অনেক উপকার করে। কাশি, সর্দি, হাঁপানি কমাতে এই বেল কাজ দেয়। পিত্তপাথুরিতে কদবেলের কচি পাতার রস ব্যবহার হয়। এতে প্রচুর আঁশ থাকে। তাই এই ফল খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। পেটের ঘা নিরাময়ে এটি ভালো কাজ দেয়। এছাড়া মাঢ়ী ও গলার ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এই ফল মধুমেহ বা ডায়াবেটিস এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এর বীজ নাকি হৃদরোগ নিরাময়ে সাহায্য করে।

সংবাদ পরিবেবা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১

সঠিক মূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বাংলাদেশে আমরাই
প্রথম এবং পথিকৃত

গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিমিটেড কর্তৃক উৎপাদিত ইনজেকশনসমূহ :

Sl. No.	Branded Generic Name	Pack size	MRP (with VAT) ৳:
1	G-Ceftriax Injection (Ceftriaxone Sodium USP)	2gm IV	170.00 per vial
2	G-Ceftriax Injection (Ceftriaxone Sodium USP)	1gm IV & IM	120.00 per vial
3	G-Ceftriax Injection (Ceftriaxone Sodium USP)	500mg IV & IM	80.00 per vial
4	G-Ceftriax Injection (Ceftriaxone Sodium USP)	250mg IV & IM	50.00 per vial
5	G-Gentamicin Injection 80mg/2ml (Gentamicin Sulphate BP)	2ml x 10	12.00 per amp
6	G-Metronidazole Infusion 500mg (Metronidazole BP)	100ml	40.00 per bottle
7	G-Atropine Injection 0.6mg/ml (Atropine Sulphate BP)	1mlx10	5.00 per amp
8	G-Diazepam Injection 10mg (Diazepam BP)	2mlx10	3.70 per amp
9	G-Cipro IV Infusion (Ciprofloxacin Lactate USP)	100ml	50.00 per vial
10	G-Dexamethasone Injection 4 mg (Dexamethasone Sodium Phosphate BP)	1mlx10	15.00 per amp
11	G-Diclofenac Injection 75mg/3ml (Diclofenac Sodium BP)	3mlx5	15.00 per amp
12	G-Ergometrine Injection 0.2mg/1ml (Ergometrine Maleate BP)	1mlx5	7.45 per amp
13	G-Ephedrine Injection 5mg/ml (Ephedrine Hydrochloride BP)	5mlx5	25.00 per amp
14	G-Ferric Injection 500mg/10ml (Ferric Carboxymaltose INN)	10ml	400.00 per vial
15	G-Furosemide Injection 20mg/2ml (Furosemide BP)	2mlx10	8.00 per amp
16	G-Ketamine Injection 50mg/ml (Ketamine Hcl USP)	10ml	97.00 per vial

Sl. No.	Branded Generic Name	Pack size	MRP (with VAT) ৳:
17	G-Mag Sulph Inj. 40gm/100 ml (Magnesium Sulphate $7H_2O$ BP)	100ml	50.00 per vial
18	G-Mag Sulph Inj. 2.47gm/ 5ml (Magnesium Sulphate $7H_2O$ BP)	5mlx5	20.00 per amp
19	G-Morphine Injection 15mg/ml (Morphine Sulphate BP)	1mlx5	40.00 per amp
20	G-Neostigmine Inj. 105gm/ml (Neostigmine Methyl Sulphate BP)	1mlx5	10.00 per amp
21	G-Pethidine Injection 100mg/2ml (Pethidine Hydrochloride BP)	2mlx5	34.50 per amp
22	G-Thiopental Injection (Thiopental Sodium BP)	500mg	60.00 per vial
23	G-Thiopental Injection (Thiopental Sodium BP)	1g	100.00 per vial
24	G-Meropenem Injection 1gm (Meropenem USP)	1gm	400.00 per vial
25	G-Vancomycin Inj. 1g (Vancomycin Hydrochloride USP)	1g	200.00 per vial
26	G-Vancomycin Inj. 500mg (Vancomycin Hydrochloride USP)	500mg	125.00 per vial
27	G-Lidocaine Injection 2% (Lidocaine Hydrochloride BP 20mg)	50ml	25.00 per vial
28	G-Lidocaine 2% with Adrenaline (Lidocaine Hydrochloride BP 20mg + Adrenaline 10 microgram as Adrenaline Acid Tartrate BP)	50ml	57.00 per vial
29	G-Omeprazole Injection Omeprazole Sodium (Sterile) BP Equivalent to 40 mg Omeprazole	40mg	50.00 per vial
30	G-Bupivacaine Inj. HEAVY (Bupivacaine Hydrochloride USP 5mg Dextrose Anhydrous USP 80mg)	4ml x 5	30.00 per amp

We Serve People & Ensure Quality

দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে

গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিমিটেড

সুলভ মূল্যে আন্তর্জাতিক মানের ওষুধ উৎপাদনই আমাদের বৈশিষ্ট্য

নাৎসি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে নোবেল জয় : বিজ্ঞানী হফম্যানের ছোটবেলা

সিদ্ধার্থ মজুমদার
কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (CSIR)-এর অধীনস্থ ভারতীয় রাসায়নিক জীববিজ্ঞান সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত গবেষক এবং হায়ার একাডেমিকস (গবেষণা ও উন্নয়ন) প্রশাসক

হাড়-কাঁপানো শীতের সন্ধ্যে। তখনও আকাশে চাঁদ ওঠেনি। যতদূর চোখ যায় চারপাশে শুধু জমাট অন্ধকার। চিলেকোঠার ছোট্টো ঘরটিতে একটি মাত্র জানালা, কম্বল দিয়ে আড়াল করা। সেই জানালাও সব সময় বন্ধ থাকে। ঘরে কোনো আলোও জ্বালানো যাবে না। তাহলেই বাইরের মানুষ টের পেয়ে যাবে ওই ঘরে কেউ রয়েছে, আর টের পেলেই মৃত্যু অনিবার্য! ঘরের বাসিন্দা সাড়ে-পাঁচ বছর বয়সের একটি ছেলে আর তার মা। জানালার খড়খড়ি সরিয়ে ছেলেটি উঁকি মেরে বাইরে তাকায়; অন্ধকার.... কিছুই প্রায় দেখা যায় না। তবু ছেলেটি তাকিয়ে থাকে, যতদূর দৃষ্টি যায়। কারও পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কি না, কিংবা কোনো অস্পষ্ট ছায়া সরে গেল কি না – বোঝার চেষ্টা করে সে। ছোট্ট ছেলেটির কাছে ওই জানালার ফাঁক দিয়ে আসা এক চিলতে আলোই পৃথিবী।

যে ঘরে ওরা আছে, সেই বিল্ডিংটি একজন ইউক্রেনিয়ান শিক্ষকের। বিল্ডিং-এর নিচের তলার একটি ঘর বাচ্চাদের স্কুল হিসেবে ব্যবহার হয়। যে জায়গার কথা বলছি সেটি তৎকালীন দক্ষিণ পোল্যান্ড-এর (বর্তমানে ইউক্রেন) অন্তর্গত 'জোলেখিভ' নামের একটি জায়গা। আর যে-বাচ্চা ছেলেটির কথা বলছি ওর নাম রোয়াল্ড সাফ্রান। বাবা-মা দু'জনেই ইহুদি। বাবার নাম হিলাল সাফ্রান, যিনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। মা ক্লারা রোজেন স্কুল শিক্ষিকা। জানুয়ারির ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪এর জুন – এই পনেরো মাস মা আর ছেলে ওখানে লুকিয়ে ছিল। আশ্রয়দাতা পরিবারের কর্তা ও গিন্নি ছাড়া আর কেউই জানত না এ বিষয়ে। এমনকি পরিবারের অন্য সদস্যরাও জানত না।

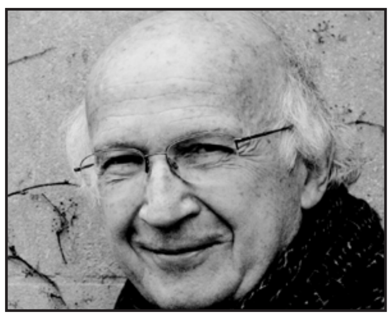

রোয়াল্ড হফম্যান পোলান্ডের (বর্তমানে ইউক্রেন) এই বাড়িতে মায়ের সঙ্গে লুকিয়ে ছিলেন।

এবার এখান থেকে আরও কয়েকমাস পেছনে চলে যাব। ১৯৪১ সালের কথা। নাৎসি বাহিনী সে সময় পোল্যান্ড আক্রমণ করেছে। ইহুদিদের দেখলেই নাৎসি বাহিনী বন্দি করছে নির্বিচারে, তারপর অকথ্য অত্যাচার। হিলাল সাফ্রান, ক্লারা এবং তাঁদের চার বছরের সন্তান রোয়াল্ড, নাৎসি-শাসিত লেবার ক্যাম্পে নজরবন্দি হয়ে দুঃসহ জীবন কাটাচ্ছে সেসময়। হিলাল সাফ্রানের বাবা, ভাই এবং আরও বেশ কিছু আত্মীয় পরিজনেরও ঠাঁই হয়েছে ওই ক্যাম্পে। কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই বেশ কয়েকজন নজরবন্দিকে হত্যা করে নাৎসিরা। হিলালের বেশ কয়েকজন আত্মীয় পরিজনও রেহাই পেল না। চারপাশ জুড়ে শুধু আতংক, বীভৎসতা, রক্ত আর বারুদের গন্ধ। নির্বিচারে হত্যালীলা চলছে। শুধু তা-ই নয়, ওখানকার স্থানীয় ইউক্রেনিয়ান বাসিন্দা যারা, তারাও আজ জার্মান নাৎসি-বাহিনীর হত্যালীলায় সহযোগিতা করছে। যাদের সঙ্গে একসঙ্গে ওঠাবসা করেছে কয়েক মাস আগেও, সেই মানুষগুলিও আজ শত্রু।

ছোট্ট রোয়াল্ডের বাবা হিলাল সাফ্রান একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আর সে কারণেই রাস্তা-ঘাট বা ব্রিজ মেরামতি করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে তাঁকে প্রয়োজন পড়ে নাৎসিদের। সেই জন্যে ক্যাম্পে অন্য বন্দিদের ক্ষেত্রে যেমন কড়াকড়ি, সাফ্রানের ক্ষেত্রে সেসব ছিল অনেকটাই শিথিল। আর এই শিথিলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে সাফ্রান এবং অন্য কয়েকজন ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসার পরিকল্পনা করতে থাকে। কাজটা খুব সাবধানে করতে হবে। একটু অসাবধান হওয়া মানেই একসঙ্গে সবার মৃত্যু। প্রথম দফায় স্ত্রী আর শিশুপুত্রকে লেবার ক্যাম্প থেকে অতি গোপনে বের করে এনে সেই সহৃদয় ইউক্রেনিয়ান শিক্ষকের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন হিলাল। স্ত্রী আর ছেলেকে ক্যাম্প থেকে সরিয়ে আনলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজে রেহাই পেলেন না। কয়েক মাস পরেই ক্যাম্প থেকে পালানোর পরিকল্পনাকারী হিলাল সাফ্রান এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে গুলি করে হত্যা করল নাৎসিরা। বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল সাফ্রানের শরীর। এদিকে ছোট্টো রোয়াল্ড সেই চিলেকোঠার ঘরে অপেক্ষা করে থাকে কখন তার বাবা ফিরে আসবে। রোজ উঁকি মেরে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে আর মা'কে জিজ্ঞেস করে, বাবা কখন আসবে? ক্লারা বুঝে গেছেন স্বামীর কী পরিণতি হতে পারে।

সেদিনের সেই রোয়াল্ড হিলাল আজকের বিশ্ববন্দিত নোবেলজয়ী তাত্ত্বিক রসায়ন বিজ্ঞানী রোয়াল্ড হফম্যান। নোবেল পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন আরও অজস্র গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার ও

স্বীকৃতির শিরোপা। 'উডওয়ার্ড-হফম্যান রুলস অফ অরবাইটাল সিমেট্রি' – উচ্চতর রসায়নে প্রসিদ্ধ এই সূত্রটির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন যে দু'জন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী তাঁদের একজন রবার্ট বার্নস উডওয়ার্ড আর অন্যজন রোয়াল্ড হফম্যান। ইলেকট্রন অরবাইটালের সিমেট্রিক্যাল চরিত্র থেকে রোয়াল্ড হফম্যান দেখিয়েছেন রাসায়নিক বিক্রিয়ার পথ। ১৯৮১ সালে রসায়নবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। বর্তমানে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফ্র্যাংক এইচ টি রোডস অফ হিউম্যান লেটারস' প্রফেসর (এমিরিটার্স) হিসেবে যুক্ত আছেন রোয়াল্ড।

শৈশবের অস্থির বিপন্নতার অজস্র স্মৃতি আজও রোয়াল্ডের মনে গেঁথে আছে। যে শহরে থাকতেন, সেখানে চার হাজার ইহুদির মধ্যে বেঁচে ছিল মাত্র দুশো জন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে পোল্যান্ড এবং চেকোস্লোভাকিয়ার সীমানা পেরিয়ে অস্ট্রিয়া এবং জার্মানিতে একটার পর একটা উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয়। এই সময় মা আবার বিয়ে করেন। শেষে ১৯৪৯ সালে এগার বছর বয়সে রোয়াল্ড, মা এবং সৎ পিতার সঙ্গে এলেন আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটিতে। শুরু হলো নতুন এক জীবন। এগার বছর বয়সে মাতৃভূমি ছেড়েছিলেন, তারপর সাতান্ন বছর বয়সে ২০০৬ সালে ইউক্রেনে এসেছেন সপরিবারে। স্কুলঘরের সেই চিলেকোঠার ঘর আর সেই সহৃদয় ইউক্রেনিয়ান পরিবারের সঙ্গে ফিরে দেখেছেন মাতৃভূমি। ২০১৭ সালে রোয়াল্ড হফম্যানের ৮০তম জন্মদিনে এবং নোবেল পুরস্কারের কথা মনে রেখে, তাঁর সম্মানে পোস্টাল স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছে মাতৃভূমি ইউক্রেনের সরকার।

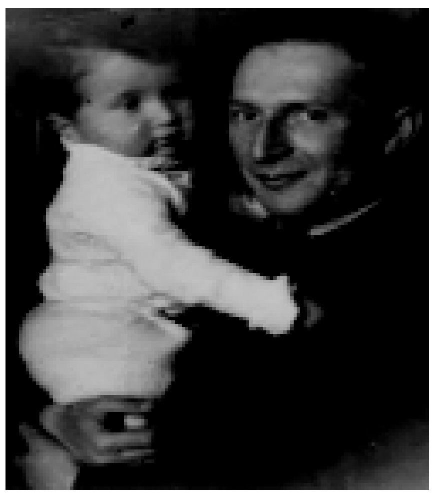

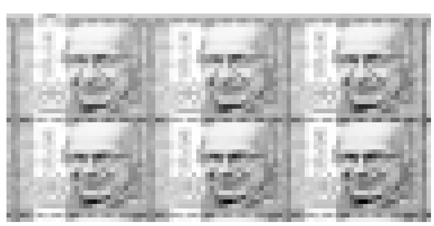

রোয়াল্ড হফম্যানের সম্মানে ইউক্রেন সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পোস্টাল-স্ট্যাম্প।

শুধু গবেষণাগারের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় রোয়াল্ড হফম্যানের যাপন। রাসায়নিক বিক্রিয়া, বিশ্লেষণ এবং অণু-পরমাণুর অন্দরমহলের হালহকিকতের খোঁজ রাখার বাইরেও রয়েছে তাঁর স্বকীয় জীবনবীক্ষা আর সৃজনশীলতার জগৎ। যেখানে কাব্য-সাহিত্য-শিল্পকলা আর সংস্কৃতির সারস্বত সাধনা। পাশাপাশি মানবহিতৈষণা এবং বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস। তিনি একজন সমাদৃত কবি, লেখক এবং নাট্যকারও। কবিতার সঙ্গে এই বিজ্ঞানীর সম্পর্ক নিবিড় এবং দীর্ঘ পাঁচ দশকের মতন। অসামান্য মনন ঋদ্ধ ছ'টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। কবিতা ছাড়াও সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞানের মিশ্রণে আরও কয়েকটি অসাধারণ গ্রন্থ রয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর প্রত্যেকটি বই। এছাড়াও আছে তিনটি নাটকের বই। হফম্যান এবং স্ট্যানফোর্ডের বিশ্ববন্দিত রসায়নবিদ কার্ল জেরাসির লেখা বিপুল জনপ্রিয় 'অক্সিজেন' নাটকটি কমবেশি পনেরোটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অক্সিজেন আবিষ্কারের পেছনে জড়িত সাফল্য, খ্যাতি, কৃতিত্বের কাড়াকাড়ি, নীতিহীনতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা – বিজ্ঞান ইতিহাসের এ রকম নানা টানাপোড়েন নিয়ে নির্মিত হয়েছে এই নাটক। আমেরিকা ও ইউরোপের বেশ কয়েকটি জায়গায় মঞ্চস্থ হয়েছে এবং অর্জন করেছে বিপুল জনপ্রিয়তা।

রোয়াল্ড হফম্যানের লেখা 'সামথিং দ্যাট বিলংস টু ইউ' নামের একটি আত্মজীবনী মূলক নাটকে ধরা আছে জার্মান অধ্যুষিত পোল্যান্ডে হলোকস্ট থেকে বেঁচে যাওয়া একটি সাত বছরের জীবনের সেই মর্মন্তুদ কাহিনি। ইউক্রেনিয়ান স্কুলের চিলেকোঠার ঘরে মায়ের সঙ্গে লুকিয়ে থাকা সেই ভয়াবহ দিনের কথা। ফুটে উঠেছে মানুষের নিষ্ঠুরতা, উদ্বাস্তুদের বিপন্নতা, যন্ত্রণা। যেমন তাঁর লেখা 'ফিল্ড অফ ভিউ' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে চিলেকোঠার সেই ছোট্ট আকাশ দেখতে না-পাওয়া জানালা দিয়ে দেখা নীচে স্কুলের বাচ্চাদের খেলাধুলো।

"From the attic the boy saw,
as children played,
but they always ran away
From the window frame."

শুধু গবেষণাই নয়। রসায়নের প্রাজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে সমাজ ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত তাঁর ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলিও অনবদ্য। তিনি মনে করেন, শিক্ষকতা এক মহান দায়িত্ব। কেবলমাত্র উচ্চতর গবেষণামূলক তাত্ত্বিক রসায়নের বক্তৃতা নয়, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের একটি প্রাথমিক কোর্সেও পড়িয়েছেন তিনি বছরের পর বছর। যে ক্লাসে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আটশো পঞ্চাশের কাছাকাছি; এতটাই জনপ্রিয় তাঁর এই ক্লাস। তাঁর নিজের কথায় : 'আমি বিজ্ঞানী না হলে আর্ট হিস্টোরিয়ান হতাম। ... নিজের প্যাশানকে কখনও প্রফেশনের জন্যে ছেড়ে দিতে নেই। আমি কবিতা এবং আর্ট হিস্ট্রিতে প্যাশোনেট ছিলাম। আর হ্যাঁ, আমি রসায়নবিদ হয়েছি, এই বিভাগে প্যাশোনেট থেকেছি, যা আমার পক্ষে সঠিক পথ হয়েছে। কিন্তু আমি কবিতা আর আর্ট হিস্ট্রিতে আগ্রহ ও অনুরাগ বজায় রেখেছি।' বৈজ্ঞানিক সত্তার সঙ্গে কবি সত্তার এক অসম্ভব সুন্দর সহবস্থানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রোয়াল্ড হফম্যান। আজও বিজ্ঞান, কবিতা ও শিল্পের গভীরতম সৌন্দর্যের মৌন সংলাপ লিখে চলেছেন বিশ্ববন্দিত এই বিজ্ঞানী ও শিক্ষক।

▲গণস্বাস্থ্য

প্রচ্ছদ রচনা

বাঙালির অসুখবিসুখ

নৃপেন ভৌমিক
স্নায়ুশল্যবিদ, কলকাতা

যেসব অসুখে বাঙালি এখন ভোগে সেসব অসুখে প্রাচীনকালেও বাঙালি ভুগতো। চর্ম রোগ, সাপে কাটা, গুটি বসন্ত, কলেরা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, গোদ, মৃগী রোগ ইত্যাদি নিয়েই সেকালের বাঙালির ছিল দৈনন্দিন জীবন যাপন। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, সর্প-দংশন এবং ইনফ্লুয়েঞ্জায় সেকালে যে কত মানুষ মারা গেছে তার কোনো হিসাবনিকাশ নেই।

প্রাচীন বাংলার অসুখবিসুখ

জ্বর, চর্ম রোগ, বসন্ত, পেটের রোগ, ওলা-ওঠা, পিলে রোগ, পাণ্ডু রোগ, গোদ, ন্যাবা, সর্পদংশন ইত্যাদি ছিল প্রাচীন বাঙালির নিত্যসঙ্গী। তার সঙ্গে মাঝেমাঝে এসে যোগ হতো 'মহামারি' নামক মড়ক।

জ্বর

সংস্কৃত শব্দ (সংস্কৃত. √ জ্বর্‌ + অ)। এর অর্থ সর্বাঙ্গের তাপ বৃদ্ধি ও নাড়ির হার বৃদ্ধি। 'জ্বরঘ্ন, জ্বরান্তক' মানে জ্বর নাশক ওষুধ (জ্বরঘ্ন ওষুধ)। 'জ্বরঠুঁটো' অর্থ জ্বর ভোগের ফলে ঠোঁটে যে ফোসকা ও ঘা হয়। 'জ্বরাক্রান্ত, জ্বরিত' অর্থ যিনি জ্বরে আক্রান্ত। 'জ্বরাতিসার' মানে উদরাময় সহ জ্বর রোগ। জ্বর আসলে কোনো রোগ নয়, অন্যান্য রোগের একটি লক্ষণ মাত্র।

কালাজ্বর

অসমিয়া ভাষার শব্দ 'কাল' (সময়) ও ফারসি শব্দ 'আজার' (ব্যাধি) শব্দ মিলে কাল-আজার শব্দটি গঠিত হয়েছিল। এর অর্থ ব্যাধির সময়, ব্যাধি-কাল। এই রোগ হলে দীর্ঘমেয়াদি জ্বর হয় এবং চামড়া কালো হয়ে যায়। কাল-আজার শব্দটির অর্থ সাধারণ বাঙালির জানা ছিল না। তাই তারা রোগটির নাম দিয়ে দেয় কালাজ্বর, অর্থাৎ যে জ্বরে চামড়া কালো হয়ে যায়। শব্দের এই রকম পরিবর্তনকে লোকনিরুক্তি বলা হয়।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

বেলেমাছির কামড়ের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে পড়া লিশম্যানিয়া ডোনোভানি নামক পরজীবী (Parasite) যে এই রোগের কারণ তা হালে জানা গেছে। প্রাচীন বাংলার দরিদ্র বাঙালি যারা মাটির ঘরে বসবাস করত বা গোয়ালঘরের আশপাশে থাকত তারাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হতো।

কালাজ্বর হলে শরীরে যেসব উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা যায় সেগুলি হলো : বার বার জ্বর আসা, চামড়া কালচে হওয়া, রক্তাল্পতা দেখা দেওয়া, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, যকৃত ও প্লিহা বড় হওয়া, শারীরিক দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি। বাঙালি চিকিৎসক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ১৯২২ সালে কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কার করার ফলে রোগটির প্রকোপ কমতে থাকে।

এই রোগে কত বাঙালি যে প্রাণ হারিয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। সত্যজিৎ রায়ের বাবা সুকুমার রায় ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে এই রোগে মারা যান। তার এক বছর আগেই ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কৃত হলেও তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কলকাতার ডাক্তারদের এই ওষুধ প্রয়োগের ছাড়পত্র দেয়নি। ফলে সুকুমার রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া শব্দটি এসেছে ইতালি ভাষা থেকে। ইতালীয় শব্দ 'malo' মানে খারাপ এবং 'aria' মানে বায়ু। প্রাচীন মানুষ বিশ্বাস করতো যে, যেখানে দূষিত জলা জমি আছে সেখানেই ম্যালেরিয়ার উপদ্রব বেশি। তাই এমন নামকরণ। প্রাচীন বাংলায় এই রোগটি পালা-জ্বর বা কম্প-জ্বর নামে পরিচিত ছিল। পালাক্রমে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসতো বলে এমন নামকরণ। জোলো বাংলার প্রায় ঘরে ঘরে এই রোগের উপস্থিতি ছিল এবং বহু রোগী এতে প্রাণ হারাতো।

রোনাল্ড রস

প্রথম দিকে মাথাব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীর শীত শীত অনুভব হয় এবং কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। কয়েক ঘণ্টা পর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। পরে আবার জ্বর ফিরে আসে। তৃতীয় পর্যায়ে রোগীর দেহে রক্তাল্পতা দেখা দেয়, রোগী ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। রোগীর যকৃত ও পিলে বড় হয়। রোগী ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগুতে থাকে।

১৮৯৭ সালে রোনাল্ড রস কলকাতার পি.জি. হাসপাতালে বসে আবিষ্কার করলেন ম্যালেরিয়া রোগের পরজীবী 'প্লাসমোডিয়াম' কীভাবে মশার শরীর থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, তার সম্পূর্ণ জীবন চক্র। রোনাল্ড রস-ই প্রথম বুঝেছিলেন ম্যালেরিয়া রোগের কারণ হলো এক ধরনের পরজীবী, যার বৈজ্ঞানিক নাম প্লাসমোডিয়াম। পরে একটি অ্যানোফিলিস জাতীয়

স্ত্রী-মশার পেটে প্লাসমোডিয়ামের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে রোনাল্ড রস বুঝতে পারেন যে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু প্লাসমোডিয়াম হলেও সেটি ছড়ায় অ্যানোফিলিস স্ত্রী-মশার মাধ্যমে। অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ালে রোগীর রক্তে মিশে থাকা প্লাসমোডিয়াম মশার শরীরে প্রবেশ করে এবং গ্যামেটোসাইটে পরিণত হয়ে মশার লালায় প্রবেশ করে। এই মশা এবার কোনো সুস্থ মানুষকে কামড়ালে তার শরীরে প্লাসমোডিয়ামের গ্যামেটোসাইট ঢুকে তাকে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত করে। রোনাল্ড রস এই যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছিলেন কলকাতায় বসে।

সেকালে সিনকোনা গাছের তিক্ত ছাল ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও তা ছিল গরিব বাঙালির ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। ১৬৪৯ সাল নাগাদ ইংল্যান্ডে এটি 'জেসুইট পাওডার' নামে পাওয়া যেত। আমদানি হতো পেরু থেকে।

খোস-পাঁচড়া

খোস শব্দটি বাংলায় এসেছে সাঁওতালি ভাষা থেকে, যার অর্থ চুলকানি। মতান্তরে, সংস্কৃত 'খস' থেকে খোস। খোস আর পাঁচড়া সমার্থক শব্দ। 'পাঁচড়া' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'পিচ্ছট' শব্দ থেকে, যার অর্থও চুলকানি। খোস-পাঁচড়া বাংলার প্রাচীনতম ছোঁয়াচে রোগ। যেহেতু রোগটি ছোঁয়াচে, সেহেতু খুব সহজেই পরিবারের অন্য সদস্যরাও এতে আক্রান্ত হতো। আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের অন্য সদস্য যারা একই বিছানা, গামছা ও কাপড়-চোপড় ব্যবহার করতো তারাও এতে আক্রান্ত হতো। চুলকানি এই রোগের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। বাংলার বর্ষাকালীন স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া এই রোগের সহায়ক ছিল।

দাদ

শব্দটি তদ্ভব, বাংলায় এসেছে সংস্কৃত 'দদ্রু' থেকে। এই চর্মরোগও বাঙালির সুপ্রাচীন রোগ। কুঁচকি, বগল, কাঁকাল, স্তনের নীচের চামড়ার চুলকানি রোগ। বর্ষাকালে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এর প্রকোপ বাড়ে।

উকুন

সাঁওতালি উৎসের দেশি শব্দ, এসেছে সাঁওতালি শব্দ 'ইকুন' থেকে। এরা বসতি গড়ে দেহপৃষ্ঠে – মাথা, বগল ও জঘনে।

গুটি বসন্ত

গুটি বসন্ত সেকালের বাংলায় একটি মারাত্মক ব্যাধি ছিল। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুসারে শীতলা দেবীর রোষেই মানুষ বসন্তজাতীয় চর্মরোগে আক্রান্ত হয়। এই কারণেই গ্রামবাংলায় বসন্ত রোগ 'মায়ের দয়া' নামে অভিহিত হতো। তাই কেউ বসন্তে আক্রান্ত হলে শীতলা দেবীকে পূজা নিবেদন করে তার আরোগ্য কামনা করা ছিল প্রাচীন বাঙালি হিন্দু সমাজের একটি রীতি।

বঙ্গদেশে এই রোগটি কয়েক শতাব্দী ধরে বিরাজ করেছে। ১৯৫৭-১৯৫৯ সালে সংঘটিত এক ব্যাপক মহামারিতে লক্ষাধিক লোক এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় ৮৬,০০০ রোগী মারা যায় বলে তথ্য মেলে। ১৯৭০ সালেও লক্ষাধিক মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। পরবর্তী কয়েক বছরে ভারত সরকার এবং জাতিসংঘের সহায়তায় গঠিত একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালে ভারতকে গুটি বসন্ত মুক্ত ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৮০ সালে বিশ্বকে গুটি বসন্ত মুক্ত ঘোষণা করা হয়।

ফোড়া

তদ্ভব শব্দ, এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'স্ফোটক' থেকে। 'বয়স ফোড়া' মানে বয়ঃসন্ধি কালে এবং যৌবন কালে ওঠা মুখের ব্রণ। 'বিষ ফোড়া' মানে প্রদাহময় ফোড়া, দুষ্টব্রণ। 'লোম ফোড়া' অর্থ লোমকূপের ফোড়া। এই ফোড়াতে চন্দ্রবিন্দু নেই, কিন্তু সুই ফোঁড়াতে আছে।

গোদ

দেশি শব্দ। এর অর্থ পায়ের চামড়া ফুলে হাতির পায়ের মতো মোটা হয়ে যাওয়া। এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'শ্লীপদ'। গোদ থেকে এসেছে 'গোদা' যার মানে অত্যন্ত মোটা (গোদা লোকটা)। 'গোদের উপর বিষফোড়া' বাগ্‌ধারার অর্থ এক যন্ত্রণার উপর তীব্রতর আরেক যন্ত্রণা যুক্ত হওয়া।

সাপে কাটা

সাপ এসেছে সংস্কৃত 'সর্প' থেকে। সাপে কাটা মানে সাপে কামড়ানো। বাংলার কৃষি-সভ্যতার শুরুতে সাপের উপদ্রব খুবই ছিল; বিষধর সাপের কামড়ে অনেককেই প্রাণ দিতে হতো। এখনও হয়। যেসব বিষাক্ত সাপ বাংলায় মৃত্যু ঘটায় তাদের মধ্যে প্রধান চারটি হলো চন্দ্রবোড়া, কালাচ, কেউটে ও গোখরো।

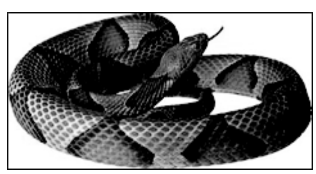
চন্দ্রবোড়া

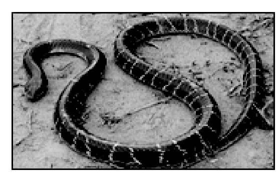
কালাচ

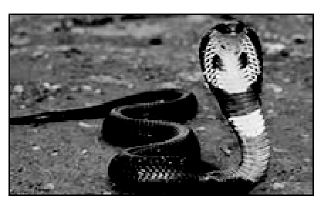
কেউটে

গোখরো

গ্রামাঞ্চলে আজও সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করে ওঝা, গুণিনরা। আর দংশিত ব্যক্তির পরিজনরা করে মনসা পূজা! ঐতিহাসিকরা মনে করেন, সর্প বিদ্যায় পারদর্শী কোনো নারী ছিলেন নাগ রাক্ষসী। মনসা পূজাই তার অন্যতম সাক্ষ্য। পুণ্ড্র দেশে গুপ্ত যুগের শেষ ভাগে এই প্রথার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল।

উদরাময়, ডায়ারিয়া

উদর + আময় (= রোগ)। মানে পেটের রোগ। হালে জানা গেছে যে, এটি একটি জলবাহিত রোগ। প্রাচীন বাংলার ঘরে ঘরে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল বলে বাঙালিকে পেট রোগা বলা হতো। বাংলায় উদর শব্দের বর্তমান অর্থ পেট। এর মূল অর্থ কিন্তু 'পেট' ছিল না। সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত উদর শব্দের অর্থ ছিল – যা থেকে বায়ু নির্গত হয়। এঁদো পুকুর, পচা ইঁদারা, গোবরের স্তূপ এবং মানুষের পেট ইত্যাদি থেকে বায়ু নির্গত হতে পারে। এই রকম বায়ু নির্গমন থেকে পেটের প্রতিশব্দ হিসাবে সংস্কৃত 'উদর' বাংলায় এসেছিল। বাংলায় ব্যবহৃত দেশি শব্দ 'পেট' এসেছে তামিল শব্দ 'পেট্টু' থেকে।

ওলাওঠা

ওলাওঠা বাংলা শব্দ। বাংলা. ওলা (নামানো) + উঠা (বমি)। এর সংস্কৃত নাম 'বিসূচিকা', ইংরেজি নাম কলেরা। কলেরা এসেছে ইংরেজি শব্দ 'cholera' থেকে। প্রাচীন বাংলায় এই রোগ 'ওলা-উঠা' নামে পরিচিত ছিল।

কলেরা একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ যা প্রাচীন কাল থেকে বহু বাঙালির জীবন নিয়েছে। হিন্দু বাঙালির বিশ্বাস ছিল, কলেরা প্রতিরোধের লৌকিক দেবী হলেন ওলাইচণ্ডী। তাই প্রাচীন বাঙালি ওলাইচণ্ডী দেবীর পূজা করতো। ওলাইচণ্ডীকে মুসলমানের দেওয়া নাম হলো 'ওলাবিবি'।

কলেরার প্রধান উপসর্গ হলো মারাত্মক উদরাময়, বারংবার প্রচুর জলের মতো পাতলা পায়খানা, সঙ্গে পেট ব্যথা, শারীরিক দৌর্বল্য এবং জলাল্পতা। সময়মতো চিকিৎসা না হলে শেষ পর্যন্ত দেহে জলাল্পতার ফলে মৃত্যু ঘটে।

হালে জানা গেছে যে, কলেরা সংক্রমণের প্রধান বাহক পানীয় জল অথবা খাদ্য। মাঠে পায়খানা করা এবং পুকুর-নদীতে শৌচকর্ম করা বাঙলির সুপ্রাচীন অভ্যাস। সাধারণত আক্রান্ত রোগীর মলের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। পয়ঃপ্রণালীর সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাবে, আক্রান্ত ব্যক্তির মল, খাদ্য ও পানীয় জলের সংস্পর্শে এসে খাদ্য ও জলকে দূষিত করতো এবং রোগ ছড়িয়ে পড়তো দাবানলের মতো।

ব্রিটিশ আমলে ১৮১৭ থেকে ১৮২৪ সালের মধ্যে কলকাতার সন্নিহিত নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চল থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়াটিক কলেরা। তৎকালীন বঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলা ও উত্তর ভারতের কুম্ভমেলা এই মহামারিকে দাবানলে পরিণত করেছিল।

পিলে রোগ

পিলে, পিলা তদ্ভব শব্দ, এসেছে সংস্কৃত 'প্লিহা' থেকে। উপরের পেটের বাম দিকের একটি নিরেট অঙ্গের নাম পিলে বা প্লিহা। পিলে বড় হওয়াকে বলা হতো পিলে রোগ (পেট জোড়া পিলে, পিলে হয়েছে)। কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া রোগে পিলে বড় হতো।

ন্যাবা

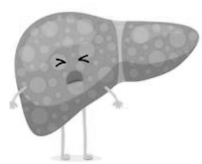

দেশি শব্দ। এই রোগে চোখ, জিভ, চামড়া হলুদ হয়ে যায় এবং হলুদ রঙের প্রস্রাব হয়। 'ন্যাবা'র সমার্থক শব্দ হলো কামলা, কাঁওলা, জণ্ডিস। কামলা সংস্কৃত শব্দ (সং. কামল + আ)। ন্যাবা বা কামলা যে ভাইরাস সংক্রমণের ফলে হতে পারে সেকালে তা বাঙালির অজানা ছিল। বর্তমানে জানা গেছে যে, এটি মূলত যকৃতের রোগ এবং যকৃতে ভাইরাসজনিত সংক্রমণ এবং পিত্ত স্রোতে অবরোধের ফলে ন্যাবা হতে পারে। এর চিকিৎসায় গ্রামাঞ্চলের লোকেরা অড়হর গাছের পাতার রস টোটকা হিসাবে ব্যবহার করতো, গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনও তা করে।

পুঁইয়ে পাওয়া

এই নামের একটি রোগের কথা প্রাচীন পুঁথিপত্রে পাওয়া যায়। এই রোগে শিশুর শরীর ক্রমশ শুকিয়ে পুঁই ডাঁটার মতো ক্ষীণ হয়ে যায়। মনে হয় এটি আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যায় উল্লিখিত 'ম্যারাসমাস' রোগ। 'পুঁই' শব্দটি বাংলায় এসেছে সংস্কৃত 'পূতিকা' থেকে।

আব

দেহে উৎপন্ন যেকোনো ধরনের অর্বুদ (Tumor) বা মাংসপিণ্ডকে বলা হতো আব। 'আব' শব্দটি তদ্ভব, এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'অর্বুদ' থেকে।

হাঁপানি

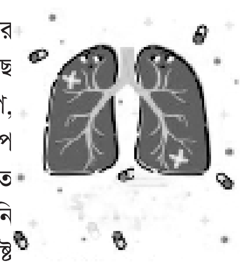

হাঁপানি অর্থ শ্বাস নেওয়া ও শ্বাস ছাড়ার কষ্ট। হাঁপানি, হাঁপি, হাঁফানি এসেছে দেশি শব্দ 'হাঁপ, হাঁফ' থেকে। 'হাঁপ, হাঁফ'-এর অর্থ দীর্ঘশ্বাস, দম (হাঁপ ছাড়া), ভয় বা কায়িক শ্রম জনিত দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলা (হাঁপ লাগা), হাঁপানি (হাঁপ ধরা, হাঁপের রোগ), শারীরিক কষ্ট ও মানসিক উদ্বেগের অবসানে স্বাভাবিক ও সহজ নিঃশ্বাস (হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম)। 'হাঁপানো, হাঁফানো' মানে ঘনঘন বা কষ্টে শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ করা (ভাবতে ভাবতে বা শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে ওঠা)। হাঁপানি আসলে ফুসফুসের রোগ। 'ফুসফুস' সাঁওতালি শব্দ।

প্লেগ

পৃথিবীর ইতিহাসে প্লেগ বা ব্ল্যাক ডেথ-এর মতো ভয়ঙ্কর মহামারি আর কখনও হয়নি। ভারতের অনেক স্থানের মধ্যে ১৮৯৬ সালে মুম্বাইয়ে এবং ১৮৯৮ সালে কলকাতায় প্লেগ-এর মহামারি ঘটেছিল। ১৯৯৪ সালেও ভারতে দুইবার প্লেগ-এর মহামারি ঘটেছিল।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

গ্রিক বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস ২,৪০০ বছর আগে প্রথম ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) রোগের লক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। এরপর বিশ্বব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারি ঘটার অনেক প্রমাণ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই রোগটি লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে।

১৯১৮ থেকে ১৯১৯ সাল সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫ কোটি মানুষ মারা যায়। ভয়াবহ এই মহামারিকে তখন নাম দেওয়া হয় 'স্প্যানিস ফ্লু' (Spanish Flu)।

১৯৫৭-১৯৫৮ সালের দিকে এশিয়াতে একটি মহামারিতে প্রায় ১০ থেকে ১৫ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এই মহামারির নাম ছিল 'এশিয়ান ফ্লু'।

১৯৬৮-১৯৬৯ সালে আর এক মহামারিতে সাড়ে সাত লক্ষ থেকে দশ লক্ষের মতো মানুষ মারা যায়। সেই সময় দেশে দেশে সরকার সাধারণ মানুষকে 'মাস্ক' পরিধানের জন্য আইন পাস করে, দীর্ঘ দিনের জন্য বড় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে জানা গেছে যে, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের জন্য দায়ী হলো একটি ভাইরাস, যা ঘন ঘন দেহের গঠন পাল্টায়। সেই কারণে আজ অবধি ইনফ্লুয়েঞ্জার কোনও কার্যকরী টিকা তৈরি করা যায়নি।

পোলিও

পোলিও এক ধরনের পঙ্গু রোগ। ভারত তথা বাংলা থেকে এই রোগটি এখনও নির্মূল হয়নি। এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি এক ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ১৯১৬ সালে পোলিও রোগ প্রথম মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সেই বছর নিউইয়র্কে ৯ হাজার মানুষ পোলিওতে আক্রান্ত হয়, যার মধ্যে ৬ হাজার মানুষই মারা যায়! নিউইয়র্ক শহর থেকে ক্রমে পোলিও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি বছর বিশ্বে কত শত মানুষ পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। অবশেষে ১৯৫০ সালে জোনাস সাল্ক পোলিও টিকা আবিষ্কার করেন।

জোনাস সাল্ক

ঘাম

এটিও বাংলার এক সংক্রামক রোগ। এতে মূলত শিশুরা আক্রান্ত হয়। কানের পাশের প্যারোটিড লালা গ্রন্থি এতে আক্রান্ত হয়। অনেক পুরুষের মুষ্ক গ্রন্থিও এতে আক্রান্ত হয়ে পরবর্তী কালে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমানে এই রোগের প্রতিষেধক টিকা দিয়ে রোগটিকে নির্মূল করার চেষ্টা চলছে।

মহামারি

বাংলার এক কবি লিখেছিলেন : 'মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি'। মহামারির সাথে বাংলার যোগ অনেক প্রাচীন। ইতিহাসে বৃহত্-বঙ্গে প্রথম মহামারির পরিচয় মেলে ১৫৪৮ খ্রিষ্টাব্দে, অধুনা বিহারে ভয়ানক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে প্লেগ রোগ, যার প্রভাব দক্ষিণ বাংলাতেও এসে পড়ে। ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় আফগান শাসন কালে, রাজধানী গৌড়-এও প্লেগ রোগ দেখা দেয়। এই সময়ে বাংলা জয় করতে আসা সম্রাট আকবর-এর সেনাপতি খান-ই-খানান মুনিম খান, তিনিও প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে গৌড়-এ মারা যান। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের মন্বন্তর পরবর্তী কালে বঙ্গদেশে কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের বোম্বে প্রদেশ থেকে বাংলায় আসা প্লেগ এবং ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ভয়াবহ স্প্যানিস ফ্লুর হাত থেকেও রেহাই পায়নি বাংলা।

ইতিহাসে উল্লেখ না থাকলেও যুগে যুগে মহামারি বিভিন্ন রূপে আছড়ে পড়েছে মানব সমাজে। মহামারির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে বিশ্বব্যাপী। সে খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বের সুমেরীয় অঞ্চলের 'নারগল' দেবতাই হোক বা আমাদের বাংলার শীতলা, ওলাই চণ্ডী বা ওলাই বিবির উপাসনাই হোক। মল্লভূমের এমনই এক প্রাচীন লৌকিক দেবীর নাম ছিল 'মহামারি দেবী'। তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের কুলদেবী। যিনি স্থানীয় ভাবে 'খচ্চর বাহিনী' নামেও পরিচিত ছিলেন। এই দেবীর পূজার প্রচলন করেছিলেন ৪৯তম মল্লরাজ, 'বারো ভুঁইয়ার' অন্যতম মহারাজ বীর হাম্বির (১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দ - ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দ)।

অপুষ্টি

প্রাচীন বাংলায় জনসংখ্যার তুলনায় চাষের জমি ছিল বেশি। ফলে অপুষ্টি বা দুর্ভিক্ষ প্রাচীন বাংলায় ছিল না বললেই চলে। অপুষ্টি ও

দুর্ভিক্ষ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা এবং তা অনেক ক্ষেত্রেই মনুষ্য সৃষ্ট। পুষ্টির অভাব হলো এমন একটি অবস্থা, যেখানে খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদানগুলি যথেষ্ট নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের অভাবে পুষ্টির ঘাটতি হয়। সম্পদের অসম বণ্টনই অপুষ্টি ও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ।

দুর্ভিক্ষ

সেকালের ভারতের মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ ধান উৎপাদন করতো বঙ্গদেশ। তা সত্ত্বেও ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তৎকালীন বাংলায় লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে মারা যায়। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে বা ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে একে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বলা হয়। বিশেষ করে দুই বাংলায় দুর্ভিক্ষের করাল থাবা ছিল সবচেয়ে করুণ। এই করুণ পরিণতির জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে সরাসরি দায়ী করা হয়েছে মধুশ্রী মুখার্জির লেখা 'চার্চিলস সিক্রেট ওয়ার' শীর্ষক একটি গ্রন্থে। লেখিকা এই দুর্ভিক্ষকে মানব সৃষ্ট বলে নিন্দা করেছেন। চার্চিলের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ তোলেন, এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পেছনে বর্ণবৈষম্যও তাকে কিছুটা উসকে দিয়েছে। এই মন্বন্তরে দুই বাংলা জুড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা যায়। ভারতবর্ষের তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক যুদ্ধে নিয়োজিত সেনা ও কর্মীদের জন্য বিপুল পরিমাণ খাদ্য মজুদ করায় এই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।

১৯৪৩ সালে জয়নুল আবেদিনের আঁকা দুর্ভিক্ষের ছবি

শস্য মজুদ করার কারণে হু হু করে বেড়ে যায় চালের দাম। একই সঙ্গে বাজারে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। জাপান ভারত দখল করলে খাদ্য যাতে শত্রুর হাতে না পৌঁছায়, এই জন্য ব্রিটিশ সরকার আগাম কিছু ব্যবস্থা নেয়। বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নৌকা ও গরুর গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয় – নয়তো ধ্বংস করে ফেলা হয়। এতে চাল বা খাদ্য বিতরণ-ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে।

এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া সহায়তার হাত বাড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু চার্চিলের মন্ত্রিসভা তা মেনে নেয়নি। এমনকি এক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র যখন নিজের জাহাজে করে খাদ্য পাঠাতে চেয়েছে, ব্রিটিশ শাসক তা-ও গ্রহণ করেনি। জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণার প্রতিবেদন অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষের পিছনে প্রাকৃতিক কারণ খুঁজে পায়নি ভারতীয় ও মার্কিন গবেষকদের একটি দল। অর্থাৎ এই দুর্ভিক্ষের জন্য আবহাওয়া নয় বরং তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের অমানবিক নীতিই দায়ী ছিল।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের অর্থনীতি সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এবং সেই দশকের শুরুতে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তবে এই দুর্ভিক্ষের মুল কারণ হিসেবে সেই সময়ে হয়ে যাওয়া ভয়াবহ বন্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষেও বাংলাদেশে অসংখ্য মানুষ অনাহারে মারা গিয়েছিল, আনুমানিক প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ। এই দুর্ভিক্ষকে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রাচীন বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা

প্রাচীন বাংলায় সংক্রামক রোগগুলি মহামারির আকার নিতো। এই সব রোগের বিরুদ্ধে বাঙালির হাতিয়ার ছিল বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা, তুকতাক-ঝাড়ফুঁক, জলপড়া, তাবিজ-কবজ এবং বিভিন্ন ধরনের টোটকা চিকিৎসা। এই সব টোটকা ও ঝাড়ফুঁক প্রয়োগের উপদেশ দিত কবিরাজ, হাকিম, পির, ওঝা এবং গুণিন। 'শীতলা', 'মনসা', 'ওলা' এই সব দেবী মারণ ব্যাধির দেবী রূপে পূজিত হতো। বসন্ত রোগের শীতলা দেবী, সর্প-দংশনের মনসা দেবী, ওলাওঠা বা কলেরার ওলা দেবীর পূজা গ্রামে-গঞ্জে এখনও বিদ্যমান। ভূত প্রেতের আছর থেকে শুরু করে রোগ-ব্যাধির নিরাময় এমনকি সাপে কাটলেও তার প্রতিকারের জন্য আলাদা আলাদা যাদু বিদ্যার আশ্রয় নিতো ওঝারা, আর এইসব কাজ করার জন্য সেই যুগে নারী ওঝাদের বেশ দাপট ছিল!

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, 'এই সকল দেব-দেবীরা আধ্যাত্মিক নন। এদের কেউ কালনাগিনীর মতো ভয়ংকর। ষষ্ঠী, চণ্ডী, নরমুণ্ডের মালা পরিহিত শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেব-দেবীরা এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়; দুই চারি ক্ষেত্রে তাহাদের কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়।'

নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে যে, প্রাক্-আর্য যুগে বাংলার শতকরা ১৫ জন মানুষ ছিল দ্রাবিড় রক্তের। এদের সঙ্গে প্রাক্-আর্য সিন্ধু সভ্যতার দ্রাবিড়দের যোগাযোগ ছিল না তা ভাবা অসঙ্গত, যদিও এই বক্তব্যের সমর্থনে আমাদের হাতে এখনও অবধি কোনও প্রমাণ নেই। সিন্ধু সভ্যতার উন্নত মানের চিকিৎসা পদ্ধতির কোনও প্রভাব আর্য ভারতে এবং প্রাচীন বাংলায় পড়েছিল কিনা তা গবেষণার দাবি রাখে।

বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল মূলত বৌদ্ধদের মাধ্যমে। পাল যুগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। তার আগে কিরাত-নিষাদের দেশ বঙ্গে প্রবেশ করলে আর্যদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। তাই আয়ুর্বেদ পদ্ধতি বাংলায় এসেছে অনেক পরে। খ্রিষ্ট পরবর্তী অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল রাজত্ব টিকে ছিল। বাংলার দু'জন বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞের নাম ছিল, সপ্তম শতাব্দীর মাধব কর এবং একাদশ

শতাব্দীর চক্রপাণি দত্ত। মাধব কর 'নিদান' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যা সেকালে বাগদাদের হারুন অল রশিদ কর্তৃক ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

প্রাচীন বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল মূলত ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থারই একটি অংশ। ফলে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা থাকলে বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বুঝতে সুবিধা হবে।

সিন্ধু সভ্যতার চিকিৎসা ব্যবস্থা

খ্রিষ্ট জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে আর্যরা ভারতে অনুপ্রবেশ শুরু করেছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তখন আর্যরা ছিল যাযাবর। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল নাগাদ তারা ভারতে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলে। আর্যরা এই দেশে আসার আগে ভারতের সিন্ধু নদের অববাহিকায় যে একটি উন্নত মানের নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল তা জানা গেছে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর খনন কার্যে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০০ সাল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল অবধি এই সভ্যতা সগৌরবে টিকে ছিল। যেহেতু আর্যদের আগমন এবং এই সভ্যতার ধ্বংস প্রাপ্তি প্রায় একই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল সেহেতু অনেকে মনে করে, আর্যরাই হয়তো এই সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল! তবে দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদের যে রক্তাক্ত যুদ্ধ হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রাহুল সাংকৃত্যায়ন লিখেছেন, এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কাংড়া উপত্যকা এবং তার আশপাশ অঞ্চলে এবং তা চলেছিল প্রায় ৪০ বছর ধরে। শেষ অবধি দ্রাবিড় নেতা শিবোদাস শম্বরকে আর্যরা বধ করতে সক্ষম হয়েছিল। অসংখ্য যুদ্ধ-বন্দি দ্রাবিড়কে আর্যরা তাদের দাস-দাসীতে পরিণত করেছিল। সবাইকে নয়। রাহুল সাংকৃত্যায়নের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, দ্রাবিড়দের একটি অংশের সঙ্গে আর্যদের ব্যবসায়িক সম্পর্কও ছিল। ঋগ্‌বেদে এরা 'পণি' নামে উল্লিখিত আছে। এই পণি শব্দ থেকেই পরবর্তীকালে বণিক, বানিয়া এবং বেনে শব্দগুলি বাংলায় এসেছে। পণিদের সঙ্গে আর্যদের সম্পর্ক বিষয়ে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে 'পণি ও সরমা সংবাদ' নামে একটি সম্পূর্ণ সূক্ত (১০/১০৮) আছে।

> **বাংলার দু'জন বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞের নাম ছিল, সপ্তম শতাব্দীর মাধব কর এবং একাদশ শতাব্দীর চক্রপাণি দত্ত। মাধব কর 'নিদান' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যা সেকালে বাগদাদের হারুন অল রশিদ কর্তৃক ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।**

ভারত এবং বর্তমান পাকিস্তানের এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে এই সিন্ধু সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারের মতো প্রায় শতাধিক স্থানে এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এমন একটি স্থানের নাম ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের রাখিগড়ি গ্রাম, যেখানে ২০১৬ সালে ৪৫০০ বছরের পুরানো চারটি নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। এই কঙ্কালের ডিএনএ পরীক্ষা করে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডেভিড রিক-এর নেতৃত্বে একদল গবেষক প্রমাণ করেছেন যে, সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা ছিল দ্রাবিড়। তাঁদের সেই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে 'Cell' নামক আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে (Cell, ১৭৯, ৭২৯-৩৫, ২০১৯)। অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতা ছিল দ্রাবিড় সভ্যতা। এদের যে নিজস্ব ভাষা এবং ধর্ম বিশ্বাস ছিল তা জানা গেছে খনন কার্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন সিলমোহর থেকে। মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত যোগারূঢ় শিবমূর্তির সিলমোহরই তাদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রমাণ। শিব যে অনার্য দেবতা ছিল তা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অনেক গবেষকের ধারণা, মহেঞ্জোদারো লিপির ভাষা ছিল প্রত্ন-তামিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেই লিপির পাঠোদ্ধার আজ অবধি করা যায়নি।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে পোড়া ইটের তৈরি তিন তলা পাকা বাড়ি, প্রশস্ত সড়ক, পয়ঃপ্রণালী, সাধারণের স্নানাগার, শস্যাগার, গয়না, পোড়ামাটির বাসন, নারীমূর্তি, খেলনা, পোড়া মাটির লেখ ইত্যাদি পাওয়া গেছে। যাদের এত উন্নতমানের নগর-সভ্যতা ছিল, নিজস্ব ভাষা ছিল তাদের নিশ্চয়ই একটি চিকিৎসা ব্যবস্থাও ছিল। হরপ্পায় পাওয়া কঙ্কালের দাঁত পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে যে, তখনকার মানুষ নকল দাঁত ব্যবহার করতে জানত। হরপ্পার একটি সমাধি থেকে পাওয়া এক শিশুর মাথার করোটিতে ফুটো করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। গবেষকদের অনুমান, এই করোটির বয়স ৬ হাজার বছরেরও বেশি। আর সেই করোটির মধ্যেই দেখা গেছে তুরপুন দিয়ে তৈরি করা ছিদ্র। চিকিৎসাবিদ্যার আধুনিক পরিভাষায় করোটি ফুটো করার অস্ত্রোপচারের পদ্ধতির নাম ট্রিফাইনেশন। সিন্ধু সভ্যতারও আগে, ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রথম ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলেছে মেহেরগড়ে (বর্তমানে পাকিস্তানে)। ওখানে প্রাপ্ত কঙ্কালের দাঁতে ট্রিফাইনেশন-এর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অশোক কুমার বাগচি 'Medicine in Medieval India' গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, সিন্ধু সভ্যতায় এক উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু ছিল। আত্রেয় ছিল হরপ্পার একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। বৈদিক যুগেও আমরা একজন আত্রেয়কে পাই, যিনি ছিলেন আয়ুর্বেদের কায়-চিকিৎসা পদ্ধতির জনক। এই আত্রেয়-এর গায়ের রঙ ছিল অনার্যের মতো কালো। বৌদ্ধ যুগে আর এক আত্রেয়-এর কথা জানা যায়, যার চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করেই বৌদ্ধ যুগে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থা চলতো। যদিও অশোক কুমার বাগচি মনে করেন, এই আত্রেয় আর হরপ্পার আত্রেয় একই ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু আমাদের ধারণায়, এই আত্রেয় আর হরপ্পার আত্রেয় এক ব্যক্তি নন। বৌদ্ধ যুগের এই আত্রেয় পরিচিত ছিলেন 'ভিক্ষু আত্রেয়' নামে, যিনি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ অধ্যাপনা করতেন। বুদ্ধের ব্যক্তিগত চিকিৎসক জীবক ছিলেন এই 'ভিক্ষু আত্রেয়'র ছাত্র।

মার্কসবাদী দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'ভারতের চিকিৎসা গ্রন্থগুলি প্রথমে ছিল 'সেকুলার' যা পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের সময়ে ব্রাহ্মণায়িত করা হয়েছিল।' হরপ্পার কৃষ্ণ গাত্রবর্ণের অনার্য দ্রাবিড় চিকিৎসক আত্রেয়কে তাই বোধ হয়তো পরবর্তী কালে ঋষি আত্রেয় বানানো হয়েছিল !

আর্য সভ্যতার চিকিৎসা ব্যবস্থা

ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভবের ইতিহাস বেশ বিভ্রান্তিকর। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন কালের বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে যেটি লিখিত প্রমাণ সহ টিকে আছে তার নাম আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদের প্রাচীনতম যে গ্রন্থ দুটি আজও টিকে আছে তাদের নাম : চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতা। এই সংহিতা দুটিতে গ্রিক শব্দের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে, গ্রন্থ দুটি আলেকজান্ডারের ভারত বিজয়ের পূর্বেই রচিত হয়েছিল। আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন ৩২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

আয়ুর্বেদ

আর্য যুগে ভারতে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তার নাম ছিল আয়ুর্বেদ। এটি আর্যদের নিজস্ব আবিষ্কার না কি সিন্ধু সভ্যতা থেকে ধার করা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বর্বর আর্যরা ভারতে আসার আগে সিন্ধু সভ্যতা এবং প্রাক্-সিন্ধু সভ্যতায় অত্যন্ত উচ্চ মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু ছিল। আয়ুর্বেদ শব্দটি তৈরি হয়েছে দুটি সংস্কৃত শব্দের জোড়কলমে – 'আয়ু' অর্থাৎ 'জীবন' এবং 'বেদ' অর্থাৎ 'বিজ্ঞান'। আয়ুর্বেদ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'জীবনের বিজ্ঞান'। এটি এমনই এক চিকিৎসা পদ্ধতি যাতে রোগ নিরাময়ের চেয়ে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার প্রতি বেশি জোর দেওয়া হতো। রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা ছিল মূলত ভেষজ নির্ভর।

> **১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মেডিকেল কলেজ ছিল ভারতের প্রথম ব্রিটিশ মেডিকেল কলেজ। পঠন-পাঠনের মাধ্যম প্রথমে ছিল বাংলা, কিন্তু ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে শিক্ষার মাধ্যম হয়ে গেল ইংরেজি।**

আয়ুর্বেদ যুগে গাছপালার মাধ্যমেই মানুষের রোগের চিকিৎসা করা হতো। শল্যচিকিৎসায়ও আয়ুর্বেদ সেকালে উৎকর্ষ সাধন করেছিল। বৈদিক যুগে আয়ুর্বেদের ছিল দুটি মূল শাখা : আত্রেয়পন্থী কায় চিকিৎসা (মেডিকেল থেরাপি) এবং ধন্বন্তরীপন্থী শল্য চিকিৎসা (সার্জিকেল থেরাপি)। চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা নামক দুটি সংহিতায় যথাক্রমে এই দুটি শাখার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। কায় চিকিৎসা পদ্ধতি আবার তিন ভাগে বিভক্ত ছিল : ভেষজ চিকিৎসা (উদ্ভিজ্জ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা), রস চিকিৎসা (পারদ, গন্ধক, তামা ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা চিকিৎসা) এবং বিষ চিকিৎসা (সাপের বিষ এবং অন্যান্য বিষ দ্বারা চিকিৎসা)। বিষ চিকিৎসা পরবর্তী কালে তন্ত্র চিকিৎসা নামে পরিচিত হয়েছিল।

আয়ুর্বেদে পারদর্শী চিকিৎসককে বাংলায় বলা হতো বৈদ্য বা কবিরাজ। আর আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসার ব্যবস্থাকে বলা হতো কবিরাজি চিকিৎসা। এখানে কবি মানে কবিতা রচয়িতা নয়, অর্থ হচ্ছে সব বিষয়ে জ্ঞানী। এই সর্বজ্ঞদের মধ্যে যারা সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাদের মৈথিলি ভাষায় বলা হতো 'কবিরাজ'। সেই সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে কবিরাজ উপাধি গ্রহণ করত। মৈথিলি ভাষা থেকে বাংলায় 'কবিরাজ' কথাটি এসেছে।

বৈদিক যুগেই আয়ুর্বেদের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল। ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গৌতম বুদ্ধের জন্মের পর থেকে বৈদিক যুগের শেষ ধরা হয় এবং সেই সময় থেকেই আয়ুর্বেদের অবক্ষয় শুরু হয়। দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানই আয়ুর্বেদের অবক্ষয়ের মূল কারণ। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির দাপটে ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদ বর্তমানে 'বিকল্প চিকিৎসা' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

জোঁক চিকিৎসা

জোঁক সাঁওতালি উৎসের দেশি শব্দ, এসেছে সাঁওতালি শব্দ 'জঁক' থেকে। সেকালে যেকোনও ধরনের মাথার রোগে মাথায় জোঁক লাগিয়ে দেওয়া হতো। ধারণা ছিল, জোঁক নাকি দূষিত রক্ত টেনে নেয়। রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রিস্টলে মারা যান তখনও তাঁর মাথায় জোঁক প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাতে অবশ্য লাভ কিছু হয়নি। মাত্র দশ দিনের জ্বরে ভুগে তিনি মারা যান।

মধ্যযুগের চিকিৎসা ব্যবস্থা

ঐতিহাসিকদের মতে, ভারতে মধ্যযুগের শুরু খ্রিষ্ট পরবর্তী একাদশ শতাব্দীতে এবং শেষ খ্রিষ্ট পরবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল হলো ভারতের মধ্যযুগ। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে ভারত ছিল মুসলমান শাসনের অধীন।

মুসলমানরা যখন এই দেশে আসে তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসে ওদের চিকিৎসা পদ্ধতিও। আরবের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতির নাম ছিল তিব্বি, আর গ্রিক চিকিৎসা পদ্ধতির নাম ছিল ইউনানি। এই দুই পদ্ধতিতেই ওরা নিজেদের দেশে চিকিৎসিত হতো। এই দুইয়ে মিলে তৈরি হয়েছিল ইউনানি-তিব্বি চিকিৎসা পদ্ধতি – তারপরে শুধু ইউনানি।

ইউনানি

ইউনানি শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ আইওনিয়া থেকে। আনাতোলিয়া-এর (বর্তমানে তুরস্কের অন্তর্গত) উপকূলবর্তী গ্রিক অধ্যুষিত একটি অঞ্চলের নাম ছিল আইওনিয়া। সেটি থেকেই আরব দেশীয়রা গ্রিসকে বলতো ইউনান। আদিতে ইউনানি ছিল গ্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি। আরব দেশের লোকেরা এই পদ্ধতি গ্রহণ করে হিপোক্রেটিস-এর গ্রন্থ থেকে। মধ্যযুগে মুসলমান আমলে এই

চিকিৎসা পদ্ধতি ভারতে তথা বাংলায়ও চালু হয়। এটিও মূলত ছিল আয়ুর্বেদের মতো ভেষজ নির্ভর। বাংলায় একে বলা হতো হাকিমি চিকিৎসা বা হেকিমি চিকিৎসা। এই পদ্ধতির চিকিৎসককে বলা হতো হাকিম। হাকিম শব্দটি আরবি 'হকীম' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। যার অর্থ বিজ্ঞানী বা কুশলী।

ভারত তথা বাংলার মাটিতে আয়ুর্বেদের প্রভাব এত গভীর ছিল যে, মুসলমান শাসকের আনুকূল্য পেয়েও ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। মুষ্টিমেয় মুসলমান মানুষের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি মোগল শাসকরাও ইউনানি চিকিৎসায় আস্থাবান ছিলেন না। কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য তাঁরা হয় আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসককে নয় গোয়া থেকে পোর্তুগিজ চিকিৎসককে ডেকে পাঠাতেন।

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা

অ্যালোপ্যাথি

এই নামটি হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসার জনক হানিম্যান-এর দেওয়া। অর্থাৎ আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি। ব্রিটিশরা এদেশে আসার অনেক আগে, ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে, পোর্তুগিজরা ভারতে প্রথম ইয়োরোপীয় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলে, গোয়ায়। ১৫৪৬ সালে একটি পোর্তুগিজ পদ্ধতির মেডিকেল স্কুলও গোয়ায় চালু হয়েছিল।

বাংলায় প্রথম ব্রিটিশ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়, ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে। তার নাম ছিল পি.জি. হসপিটাল বা প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটাল – যার বর্তমান নাম এস.এস.কে.এম. হাসপাতাল। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মেডিকেল কলেজ ছিল ভারতের প্রথম ব্রিটিশ মেডিকেল কলেজ। পঠন-পাঠনের মাধ্যম প্রথমে ছিল বাংলা, কিন্তু ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে শিক্ষার মাধ্যম হয়ে গেল ইংরেজি। ইংরেজ শাসন আমলে এই পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি জনপ্রিয় হয় এবং হাতুড়ে চিকিৎসা ছাপ মেরে আয়ুর্বেদ ও ইউনানি পদ্ধতিকে পর্দার আড়ালে ঠেলে দেয়। এই পাশ্চাত্য পদ্ধতির চিকিৎসককে বলা হয় ডক্টর, বাংলায় ডাক্তার। ইংরেজি 'doctor' শব্দ থেকে বাংলায় ডাক্তার শব্দটি এসেছে। অনেকের মতে, আরবি 'দাকতুর' শব্দ থেকে বাংলা 'ডাক্তার' শব্দের উৎপত্তি। ইংরেজের ভালো জিনিসকে নিতে গিয়ে আমরা বিসর্জন দিয়েছি আমাদের নিজস্ব চিকিৎসা ব্যবস্থাকে, ভুলেছি আমাদের ঐতিহ্যকে।

হাসপাতাল

ইংরেজি হসপিটাল এসেছে লাতিন 'hospitale' থেকে, যার অর্থ অভ্যাগতকে স্বাগত জানানোর জন্য স্থান। ইংরেজি হসপিটাল শব্দের বাংলা রূপ হয়েছে হাসপাতাল।

আয়ুর্বেদ

বাংলায় এখনও আয়ুর্বেদ চিকিৎসক আছে, আয়ুর্বেদ পড়ানো হয়, আয়ুর্বেদ কলেজও আছে। কিন্তু তাদের অনেকেই আয়ুর্বেদ ডিগ্রি নিয়ে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করেন। ফলে আরও দ্রুত আয়ুর্বেদের অবক্ষয় হচ্ছে।

হোমিয়োপ্যাথি

জার্মান চিকিৎসক হানিম্যান উদ্ভাবিত এই চিকিৎসা পদ্ধতি ঊনবিংশ শতকে মহেন্দ্রলাল সরকারের হাত ধরে বাংলায় অনুপ্রবেশ করে এবং বেশ জনপ্রিয় হয়। খরচ-বহুল অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা এবং অ্যালোপ্যাথি ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বাংলার বহু মানুষকে হোমিয়োপ্যাথির অনুরাগী করে তুলেছে।

▲গণস্বাস্থ্য

পৃথিবী, পরিবেশ, মানুষ ও খাদ্য

কৃষি বৈচিত্র্য ফেরাতে ব্রিকস

ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষিতে আরো বৈচিত্র্য আনতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই গোষ্ঠীভুক্ত দেশ ভারত সহ ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা কৃষিতে বৈচিত্র্যের পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার উপর সহযোগিতাকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুরুত্ব দিয়েছে।

সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘের ২০৩০ এজেন্ডার রূপায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলি পূরণে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে ব্রিকস দেশগুলি অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে তারা ভালো জায়গায় রয়েছে। জাতিসংঘের এই এজেন্ডায় আরো বলা হয়েছে, ব্রিকস দেশগুলিতে কৃষি গবেষণায় মজবুত ভিত্তি এবং জ্ঞান বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বৈচিত্র্য নিয়ে আসার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কৃষি গবেষণা, গবেষণাধর্মী কাজকর্মের পরিধি বিস্তার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে তুলতে ভারতের উদ্যোগে বাকি ব্রিকস দেশগুলিকে নিয়ে কৃষি গবেষণা প্ল্যাটফরম গড়ে তোলা হয়েছে। গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির কৃষিমন্ত্রীদের বৈঠকে কৃষি সহযোগিতার লক্ষ্যে ২০২১-২০২৪ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা এবং ব্রিকস কৃষি গবেষণা প্ল্যাটফরমের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

সংবাদ পরিষেবা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে

বিশেষ আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

PHPC Special Photo Contest 2021
On the Occasion of the
GOLDEN JUBILEE
BANGLADESH'S INDEPENDENCE

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ছবি প্রতিযোগিতা

বীরের এ রক্তস্রোত,
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভান্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?

সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে 'আলোকচিত্রীর চোখে ১৯৭১ – বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান এবং ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ' শিরোনামে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল বিশেষ ছবি প্রতিযোগিতা 'পিএইচপিসি বিশেষ আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ২০২১'।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত বিশেষ এই আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ছিল সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্বাধীনতা যুদ্ধের চেনা-অচেনা স্মারকগুলি ক্যামেরাবন্দী করা, নতুন প্রজন্মের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া।

প্রতিযোগিতার সফল সমাপ্তির পর গত ১১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পিএইচএ মিলনায়তনে বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

স্কুল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মাধ্যমে এই আয়োজনের সূচনা হয়। জাতীয় সঙ্গীতের পর পরই সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বীরাঙ্গনাদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতার সহিত সম্মান প্রদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. মনজুর কাদির আহমেদ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্যতম ট্রাস্টি সন্ধ্যা রায়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ডা. মো. দেলওয়ার হোসেন; আশফাক আহমেদ, সভাপতি, বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি; ড. এস তাসাদ্দেক আহমেদ, রেজিস্ট্রার, গণ বিশ্ববিদ্যালয়; ডা. তারিকুল ইসলাম, পরিচালক, রিসার্চ, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ডিপার্টমেন্ট, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র; ছবি প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক বাংলাদেশের প্রথম ফিআপ স্বর্ণপদক লাভকারী আলোকচিত্রশিল্পী হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন; মো. রাকিবুল

১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

ছবি-১ : ১ মার্চ ২০২১ তারিখে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বঙ্গবন্ধু চত্বরে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. লায়লা পারভীন বানু, ডা. মনজুর কাদির আহমেদ, হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন এবং বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদ্যপ্রয়াত সম্মানিত সদস্য দেবব্রত চৌধুরীসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।
ছবি-২ : বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদ্যপ্রয়াত সম্মানিত সদস্য দেবব্রত চৌধুরীকে স্মরণ ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক শোকবার্তা পাঠ করছেন বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক খন্দকার মুফিজুল ইসলাম।
ছবি-৩ : অতিথিরা লাল-সবুজ ফিতা কেটে প্রতিযোগিতার বিজয়ী ২৯টি ছবি নিয়ে প্রথম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।
ছবি-৪ : গণ পাঠশালার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মাধ্যমে এই আয়োজনের সূচনা হয়।
ছবি-৫ : বিজয়ীদের উদ্দেশে ভিডিও বার্তায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) ডা. সিতারা বেগম, বীর প্রতীক।
ছবি-৬ : বিজয়ী এবং অনারেবল মেনশন বিভাগে নির্বাচিতরা তাদের ফ্রেমকৃত ছবি নিয়ে অতিথিদের সঙ্গে।

হাসান, সভাপতি, গণ বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ও মো. আরিফ ইসতিয়াক, সভাপতি, গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ ফটোগ্রাফি ক্লাব; এবং মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক, চিকিৎসক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ।

বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদ্যপ্রয়াত সম্মানিত সদস্য দেবব্রত চৌধুরীকে স্মরণ ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক শোকবার্তা পাঠ করেন বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক খন্দকার মুফিজুল ইসলাম।

বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সন্মানিত সভাপতিসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দের সঙ্গে গণ বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ও গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ ফটোগ্রাফি ক্লাবের সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্রতিযোগিতার ৮ জন উইনার (জনপ্রতি ১০,০০০ টাকা সমমূল্যের প্রাইজবন্ড) ও ২১ জন অনারেবল মেনশন (জনপ্রতি ২,০০০ টাকা সমমূল্যের প্রাইজবন্ড) পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজয়ীদেরকে সর্বমোট ১,২২,০০০ টাকা সমমূল্যের প্রাইজবন্ড, সম্মাননা স্মারক, সনদ, মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত বই, ফটোগ্রাফি সম্পর্কিত বই, বীরশ্রেষ্ঠ ও শহীদ বুদ্ধিজীবিদের ছবি সম্বলিত পোস্টার, ফ্রেমকৃত বিজয়ী ছবি এবং জনপ্রতি ১টি করে গাছের চারা উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে পূর্ব ধারণকৃত ভিডিও বক্তব্য প্রদান করেন ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাহত এবং অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত সেক্টর দুই-এর অধীনে প্রথম এবং বৃহত্তম যুদ্ধকালীন ফিল্ড হাসপাতাল 'বাংলাদেশ হাসপাতাল'-এর কমান্ডিং অফিসার বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) ডা. সিতারা বেগম, বীর প্রতীক।

উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি এই প্রতিযোগিতার একজন বিচারক ছিলেন। এছাড়াও পূর্ব ধারণকৃত ভিডিও বক্তব্য প্রদান করেন ছবি প্রতিযোগিতার আরেকজন বিচারক গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. লায়লা পারভীন বানু। জুম মিটিং-এর মাধ্যমে দেশী-বিদেশী অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সাভার অঞ্চলের ১০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ সালে তাদের যুদ্ধজয়ের গল্প বলার মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে আলোকিত করেছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে গণ বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ও গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ ফটোগ্রাফি ক্লাবকে 'বিপিএস অ্যাফিলিয়েটেড সদস্য' হিসেবে ঘোষণা এবং সনদ (Affiliation Certificate) হস্তান্তর করেন বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির নব-নির্বাচিত সভাপতি আশফাক আহমেদ ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে ছবি প্রতিযোগিতার বিজয়ী ২৯টি ছবি নিয়ে প্রকাশিতব্য একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয় এবং অতিথিরা লাল-সবুজ ফিতা কেটে প্রথম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীরা পিএইচএ মিলনায়তন চত্বরে ২৯টি আম্রপালি গাছের চারা রোপণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত 'জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ছবি প্রতিযোগিতা' আয়োজন করেছিল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৯ সালে দেশী-বিদেশী সর্বমোট ৩০টি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দেশব্যাপী বৃহৎ পরিসরে দ্বিতীয় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ছবি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও স্বীকৃত হয়েছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্মারক স্মৃতিস্তম্ভ নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে, ফটোগ্রাফির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে দেশ সৃষ্টির ইতিহাস জানতে উৎসাহিত করতে এই ছবি প্রতিযোগিতার আয়োজন। তাই ফটোগ্রাফির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে আমরা স্বাধীনতার ইতিহাস খোঁজার এবং জানার একটি সূত্র দেয়ার চেষ্টা করেছি। হয়তো বা ক্যামেরার চোখে সেই চিরচেনা শহীদ মিনার কিংবা স্মৃতিসৌধকে আমরা দেখতে পাবো নতুন ভাবে, নতুন কোনো রূপে! সেই সাথে ভাববো, 'এই স্বাধীনতা কি এত সহজেই আমাদের হয়েছে?'

আমাদের এবারের প্রতিযোগিতা ফটোগ্রাফির মাধ্যমে স্বাধীনতার ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্নগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আয়োজিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পর্যায়ের ছবি প্রতিযোগিতা।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের পহেলা মার্চ এই বিশেষ আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন শুরু করা হয় এবং ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত চলে ছবি গ্রহণ। পরে ৪ সদস্যবিশিষ্ট জুরি প্যানেল গঠন করা হয় এবং ২৯ ও ৩০শে নভেম্বর বিচারিক কার্যক্রম শেষে ৩০শে নভেম্বর তারিখেই ফলাফল ঘোষণা করা হয়। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার টেকনিক্যাল পার্টনার ছিল বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি এবং সহযোগিতায় ছিল গণ বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ও গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ ফটোগ্রাফি ক্লাব।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ডা. ইসতিয়াক আহমেদ, প্রভাষক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ ও ডা. ফাতিমা আমিন, প্রভাষক, ফার্মাকোলজী বিভাগ, গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ।

▲গণস্বাস্থ্য

ছবি কৃতজ্ঞতা
Bangladesh Photographic Society-BPS
GSVMC Photography Club
Gono Bishwabidyalay Photographic Society
Public Health Photo Contest

[পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলি থেকে নির্বাচিত কয়েকটি ছবি পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোয় প্রকাশ করা হলো।]

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলির কয়েকটি

National Martyrs' Memorial, Savar, Dhaka — Syed Hosni Mobarak [2010]

Mujibnagar Smriti Soudha, Mujibnagar, Meherpur — Md. Tauhiduzzaman [2021]

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলির কয়েকটি

Martyred Intellectuals' Memorial, Rayer Bazar, Dhaka — Md. Masud Rana [2021]

Martyred Intellectuals' Memorial, Mirpur, Dhaka — Md. Saiful Amin [2020]

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলির কয়েকটি

Aparajeyo Bangla, Dhaka University, Dhaka — Md. Saiful Islam Khan [2021]

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলির কয়েকটি

Central Shaheed Minar, Dhaka — Fijul Islam[2016]

Alamdanga Boddhovumi, Alamdanga, Chuadanga — Md. Tauhiduzzaman [2021]

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলির কয়েকটি

Seven Heroes of the 1971 Liberation War, Talbaria, Jessore — Md. Sajid Hasan Shahid [2018]

Babur Pukur Boddhovumi, Babur Pukur, Shahjahanpur, Bogura — Nawon Kumar Das [2021]

Pragati Insurance
Limited

Achieved

প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় অনবদ্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক মানের সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং "AAA" অর্জন করেছে, যা বাংলাদেশের বীমা শিল্পে এক অনন্য রেকর্ড।

Pragati Insurance Limited made an outstanding record by achieving International standard "AAA" Credit rating in the non-life Insurance sector in Bangladesh.

Symbol of Security

প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
Pragati Insurance
Limited

25 October 2020

Phone : PABX: 88-02-55012680-2
Web: www.pragatiinsurance.com

যে-পাঁচটি ওষুধের মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে

মানুষের বয়স যতো বাড়ে, শরীরে রোগ দানা বাঁধে ততো। সুস্থ শরীরে রোগের দাপট কম আর জীবনভর যারা শরীরের প্রতি অবহেলা করেছেন বা ব্যায়ামে অনীহা দেখিয়েছেন, বাছবিচার না-করে খাবার খেয়েছেন কিছু না ভেবেই; তাদের যথেষ্ট ভোগান্তি সইতে হয়। এই দ্বিতীয় দলভুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে ওষুধ হয়ে উঠতে পারে নিত্যদিনের সঙ্গী। কিন্তু ওষুধ মানেরই আনন্দসঙ্গী বা নির্ভয়ে রোগমুক্তির গ্যারান্টি নয়। এগুলি যেহেতু রাসায়নিক পদার্থ, তাই এর কতক বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকবেই। হতে পারে বিবিধ সমস্যা। তাই কারো কোন ওষুধ গ্রহণের পর নতুন উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা আবশ্যক। আমরা এখানে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে তেমন কিছু ওষুধের ওপর আলোকপাত করেছি।

রক্ত পাতলাকারক (Blood thinner) ও প্রেসক্রিপশনকৃত ব্যথা নিবারক যেমন আফিম (Opioids) গ্রহণে জীবন বিপন্নকারী জটিলতা হতে পারে। ওষুধের দোকান থেকে সরাসরি ক্রয়যোগ্য (OTC drugs) কিছু ওষুধপত্রের সম্ভাব্য বিপজ্জনক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। হার্ভার্ড অধিভুক্ত ব্রিগহাম এন্ড ওমেনস হসপিটালের ফার্মাসিস্ট ও এপিডেমিওলজিস্ট ডা. জসুয়া গেগনে (Dr. Joshua Gagne) বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বিরল। কোন সময়ে তার সম্ভাব্যতা শতকরা এক ভাগেরও কম। তথাপি নিচের কোন একটি ওষুধ আপনি গ্রহণ করে থাকলে তার বিরল ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে রাখুন।

এসিই ইনহিবিটর্স (ACE inhibitors)

উচ্চ রক্তচাপ হ্রাস করতে এনজিওটেনসিন রক্তপাতলাকারী এনজাইম (ACE) নিরোধক – যেমন কেপটোপ্রিল (বাণিজ্যিক নাম Acetor, Capotril ইত্যাদি), লিসিনোপ্রিল (বাণিজ্যিক নাম Acepril, Lipril, Stril ইত্যাদি) এবং রেমিপ্রিল (বাণিজ্যিক নাম Acecard, Rupril, Unipril ইত্যাদি)-এর ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়। এই শ্রেণির ওষুধ শরীরে অল্প এনজিওটেনসিন উৎপাদনে সহায়তা করে। এই রাসায়নিকটি রক্ত বাহিকাকে সরু করে।

বিরল ঝুঁকি : এসিই ইনহিবিটর্স বাহশোথ (Angioedema) নামক এলার্জিক ধরনের প্রতিক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। এতে ত্বকের নিচে দ্রুত ফুলে উঠে। যার ফলে গলা ও জিহ্বায় স্ফীতি ঘটে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে জটিলতা সৃষ্টি হয়। ডা. গেগনে বলেন, এটি চোখের পাতায় বা মুখের চারপাশে দেখা দিতে পারে, কিংবা বুকে লালচে ফুসকুড়িসহ (Hives) ঘটতে পারে।

ডায়াবেটিসের ওষুধপত্র

টাইপ-২ ডায়াবেটিসের জন্য খুব সাধারণ একটি চিকিৎসা হচ্ছে মেটফরমিন (বাণিজ্যিক নাম Bigmet, Comet, Daomin ইত্যাদি)। এটি যকৃতের গ্লুকোজ (কোষকে শক্তি প্রদানকারী সুগার) উৎপাদন হ্রাস করে, ইনসুলিন হরমোনের প্রতি কোষকে অধিক সংবেদনশীল করে তোলে (যা গ্লুকোজকে কোষে সরায়) এবং অন্ত্র থেকে গ্লুকোজের শোষণ হ্রাস করে। ডা. গেগনে বলেন, এটি পাকস্থলিকে বিপর্যস্ত ও ডায়ারিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ধারাবাহিক ব্যবহারে তা দূর হয়ে যায়।

বিরল ঝুঁকি : মেটফরমিন ল্যাকটিক এসিডোসিস (রক্তে ল্যাকটিক এসিডের পুঞ্জিভবন) ঘটাতে পারে, যা হাইপোথার্মিয়ায় (শরীরের নিম্ন তাপমাত্রা) রূপ নিতে পারে এবং রক্তচাপ কমে যেতে পারে। লক্ষণের মধ্যে রয়েছে মাংসপেশীতে ব্যথা, উদরে তীব্র ব্যথা, অস্বাভাবিক অবসাদ, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস।

স্ট্যাটিন

স্ট্যাটিন – যেমন এটোরভাস্ট্যাটিন/Atorovastatin (বাণিজ্যিক নাম Liptor, Rosuva, Taven ইত্যাদি), সিমভাস্ট্যাটিন/Simvastatin (বাণিজ্যিক নাম Avastin, Novastin, Zostin ইত্যাদি), রসুভাস্ট্যাটিন/Rosuvastatin (বাণিজ্যিক নাম Rovex, Rosu, Rolip ইত্যাদি) ও লোভাস্ট্যাটিন/Lovastatin (বাণিজ্যিক নাম Acepril, Lipril, Stril ইত্যাদি) মন্দ এলডিএল কোলস্টেরল হ্রাসে সহায়ক। দেখা গেছে এটি হৃদআক্রমণ, স্ট্রোক বা মৃত্যু ঝুঁকি কমায়। ডা. গেগনে বলেন, স্ট্যাটিন গ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ মানুষের মাংসপেশিতে বেদনা হতে পারে। এটা মারাত্মক নয়, কিন্তু কিছু মানুষ এর কারণে স্ট্যাটিন গ্রহণ থামিয়ে দেয়।

বিরল ঝুঁকি : স্ট্যাটিন মাংসপেশি কোষে অব্যক্ত জীবন বিপন্নকারী ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে পারে – যা কিডনিকে মাংসপেশি প্রোটিনে নিমজ্জিত করে ফেলতে পারে। ফলে কিডনি বিকল হয়ে যায়।

ওষুধের দোকান থেকে সরাসরি ক্রয়যোগ্য ব্যথা নিবারক

জ্বর বা মাথাব্যথার জন্য প্যারাসিটামল বা এসিটামিনোফেন (বাণিজ্যিক নাম G-Paracetamol ইত্যাদি) ও স্টেরয়েডবিহীন

প্রদাহরোধী (NSAIDs) ওষুধ যেমন আইবোপ্রোফেন (Advil, Motrin) বা ন্যাপরোক্সেন-এর মতো ওষুধপত্র ব্যবহৃত হয়। শরীরের বেদনায় NSAID-এরও ব্যবহার হয়।

বিরল ঝুঁকি : দৈনিক বৃহৎ ডোজের (৩০০০ মিলিগ্রামের অধিক) প্যারাসিটামল (এসিটামিনোফেন) সেবন যকৃতকে ক্ষতি করতে পারে এবং তাতে যকৃত বিকল হয়ে যেতে পারে। এসিটামিনোফেন গ্রহণের সময় মদ্যপান যকৃতের ক্ষতি করে। NSAIDs-এর দীর্ঘমেয়াদি এবং এমনকি স্বল্পমেয়াদি ব্যবহার আলসার, পাকস্থলিতে রক্তক্ষরণ, কিডনি সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ এবং বর্ধিত হৃদআক্রমণ বা স্ট্রোক ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত।

ফ্লুরোকুইনোলোন এন্টিবায়োটিক

একদা সাইনাস ও মূত্রনালী সংক্রমণ চিকিৎসায় জনপ্রিয় ওষুধপত্র ছিলো ফ্লুরোকুইনোলোন শ্রেণির এন্টিবায়োটিক যেমন সিপরোফ্লোক্সাসিন (বাণিজ্যিক নাম Acepril, Lipril, Stril ইত্যাদি) ও লেভোফ্লোক্সাসিন (বাণিজ্যিক নাম Ciprocin, Civox, Flontin ইত্যাদি)। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াজনিত উদ্বেগের কারণে আজকাল এদের কম প্রেসক্রাইব করা হয়।

বিরল ঝুঁকি : ২০০৮ সাল থেকে মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) এই ওষুধটির অপরিবর্তনীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রচ্ছন্ন ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করে আসছে। প্রথমে ছিলো পেশীবন্ধ (Tendon) বিদারণ, তারপর প্রান্তস্থ নিউরোপ্যাথি (অস্বস্তিকর স্নায়ু থেকে অসাড়তা ও টনটন অনুভূতি) এবং খুব সম্প্রতি (২০১৮) শরীরের প্রধান ধমনি তথা মহাধমনি (Aoarta)-এর ক্ষতি। ডা. গেগনে বলেন, মহাধমনির ঝুঁকির বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। আমাদের হাসপাতালের একটি দলের সাথে এখন আমি এ নিয়ে গবেষণা করছি।

কীভাবে নিরাপদ থাকবেন

এখানে যেসব ওষুধপত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনোটি চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্রে লিখলে এটি কেন প্রয়োজনীয় এবং কোন ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে কিনা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন। কিছু ক্ষেত্রে, যেমন স্ট্যাটিন গ্রহণের বেলায় সাধারণত সুফলের চেয়ে ঝুঁকি বেশি থাকে। মাংসপেশির ব্যথা বিরক্তিকারক এবং মাংসপেশীর কোষের ভাঙ্গনজনিত দুর্বলতা ও কিডনির ক্ষতি হবার ঝুঁকি সচরাচর দেখা যায় না। ডা. গেগনে বলেন, এসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে স্ট্যাটিন নেয়া বন্ধ করা হলে বড় ধরনের হৃদসমস্যা হচ্ছে এর মন্দ পরিণতি। মাংসপেশির ব্যথার সমস্যা হলে ওষুধ পরিবর্তন করে ভিন্ন ধরনের স্ট্যাটিন ব্যবহারের সুযোগ আছে। ওষুধের মাত্রা হ্রাস করতে আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন।

চিকিৎসক আপনাকে যেভাবে ওষুধ গ্রহণ করতে বলেছেন, সেভাবে তা গ্রহণ নিশ্চিত করুন। তাছাড়া চিকিৎসক অন্য কিছুর পরামর্শ না দিয়ে থাকলে সরাসরি ক্রয়যোগ্য ওষুধের ডোজের নিয়ম অনুসরণ করুন।

নতুন উপসর্গ পর্যবেক্ষণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। আকস্মিক কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা – যেমন উদরের ব্যথা, শ্বাস-প্রশ্বাসে জটিলতা, ফুলে যাওয়া, লালচে ফুসকুড়ি (Rash) বা পেশি সংকোচন হলে অনতিবিলম্বে চিকিৎসককে জানান। জরুরি বিভাগে যাবার প্রয়োজন হতে পারে।

▲গণস্বাস্থ্য

Harvard Health Letter, January 2020

গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ (GPL)-এর ডায়াবেটিস (বহুমূত্র, Diabetes) রোগ নিয়ন্ত্রণের ওষুধসমূহ

দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে

ওষুধের নাম (ব্র্যান্ডেড জিনেরিক)		ভ্যাটসহ GPL ওষুধের MRP	সমতুল্য কোম্পানীর ওষুধের ভ্যাটসহ MRP	অন্য কোম্পানীর ওষুধের মূল্য কত বেশী (%)
১	২	৩	৪	৫
জি-মেটফরমিন ৫০০ টেব.	G-Metformin 500 Tab.	২.৫০ টাকা/টেব.	৪.০২ টাকা/টেব.	৬০.৮০% বেশী
জি-মেটফরমিন ৮৫০ টেব.	G-Metformin 850 Tab.	৪.০০ টাকা/টেব.	৬.০২ টাকা/টেব.	৫০.৫০% বেশী
জি-গ্লিক্লাজাইড ৮০ মিগ্রাঃ টেব.	G-Gliclazide 80 mg Tab.	৩.০০ টাকা/টেব.	৮.০০ টাকা/টেব.	১৬৬% বেশী

মধু : সবচেয়ে আদিম সুখাদ্য

শান্তা আনোয়ার

মধু ঘন, বর্ণে সোনালী, খেতেও বেশ সুস্বাদু, খেলে শক্তি পাওয়া যায়, ক্ষতে লাগালে তা দ্রুত নিরাময় হয়।

'এরপরে আমি ঈশ্বরের দেয়া খাদ্যের কাছে এলাম, এটা সেই স্বর্গীয় উপহার মধু' – এটা রোমান কবি ভার্জিলের Georgics-এর একটা লাইন। মধু ছিলো প্রাচীন মানুষের প্রথম এবং প্রধান ডেলিকাসি। সবচেয়ে আদিম সুখাদ্য।

প্রাচীনকালে মধুকে মনে করা হতো প্রকৃতির অলৌকিক দান। গ্রীক ধর্মে, জিউস এবং অলিম্পাসের বারো দেবতার খাদ্য ছিল অমৃত।

হিন্দু ধর্মে, মধু জীবনের পাঁচটি অমৃতের মধ্যে একটি। মন্দিরে, মধু অভিষেক নামক একটি রীতিতে দেবতাদের উপর মধু ঢেলে দেওয়া হয়।

গ্রেকো ল্যাটিন ট্র্যাডিশনে মধুকে স্বর্গীয় খাদ্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

আমাদের ইসলাম ধর্মেও মধুকে দেয়া হয়েছে অনন্য মর্যাদা। পবিত্র কোরআনে মধুর জন্য একটি স্বতন্ত্র সূরা আছে 'নাহল'!! নাহল শব্দটির অর্থ মৌমাছি।

সূরা নাহলে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন : 'ইয়াখরুজু মিমবুতুনিহা শারাবুম মুখতা লিফুন আল্ওয়া নহু ফীহি শিফাউল লিন্নাসি।' যার অর্থ : তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। মধু হচ্ছে ওষুধ এবং খাদ্য উভয়ই। সূরা মুহাম্মদ-এর ১৫ আয়াতে আল্লাহতায়ালার এরশাদ হচ্ছে : 'জান্নাতে স্বচ্ছ মধুর নহর প্রবাহিত হবে।'

মধুকে বলা হয় খোদায়ী চিকিৎসার মহা উপাদান।

আয়ুর্বেদে বলা হচ্ছে : হে অশ্বিন, উজ্জ্বলতার প্রভু, আমাকে মৌমাছির মধু দিয়ে অভিষিক্ত করুন, যাতে আমি পুরুষদের মধ্যে জোরালো বক্তব্য দিতে পারি!

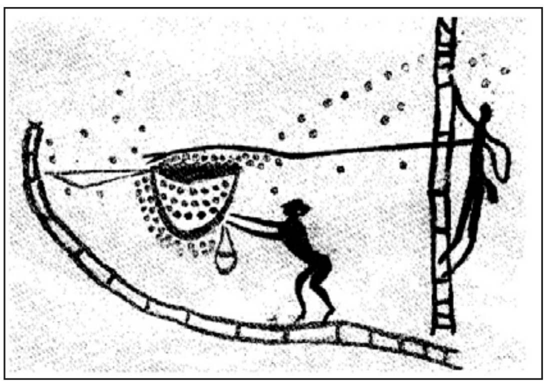

ভারতের মধ্যপ্রদেশে পাঁচমারি পাহাড়ে পাথরের উপরে আঁকা ছবিতে মধু আহরণের দৃশ্য।

স্পেনের ভ্যালেন্সিয়াতে পাথরে আঁকা ছবিতে মধু সংগ্রহের দৃশ্য।

প্রায় ৫০ মিলিয়ন বছর আগের ফসিলে আদিম মৌমাছির ফসিল পাওয়া গেছে তবে আজকের যে মৌমাছিরা আমাদের মধু দেয় সেই মৌমাছির চাইতে সেই ফসিলে পাওয়া মৌমাছির আকার ছিলো ভিন্ন।

ফসিলের মৌমাছির নাম Electrapis বা পীতাম মৌমাছি। আজকের দিনের মৌমাছি Apis mellifera-এর জন্ম এশিয়ায়। এশিয়া থেকেই সেই মৌমাছি মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপে পৌঁছে। মধু আহরণ নিয়ে সবচেয়ে প্রাচীন চিত্রকর্ম পাওয়া গেছে ভারতের মধ্যপ্রদেশে পাঁচমারি পাহাড়ে পাথরের উপরে আঁকা মধু সংগ্রহের দৃশ্য। ছবিটা আঁকা হয়েছিলো নিওলিথক পিরিয়ডে।

স্পেনের ভ্যালেন্সিয়াতেও মধু সংগ্রহের রক পেইন্টিং (Rock Painting) পাওয়া গেছে। এর পরে পাওয়া গেছে সাউথ আফ্রিকার মোজাম্বিকে। তবে সেগুলো ভারতের রক পেইন্টিং-এর চাইতে বয়সে নবীন।

মধু তৈরি হয় ফুলের আহরিত সুধা থেকে। নেকটারের বাংলা সুধা। অবশ্য মধু ও সুধা বাংলার ভাব দর্শনের দুই আধ্যাত্মিক পরিভাষা।

ক্লদ লেভি স্ট্রস ও মধু আর তামাকের মিথ নিয়ে গবেষণা করে লিখেছেন : From Honey to Ashes: Introduction to a Science of Mythology.

সেখানে মধু থেকে তৈরি মদ মিডের উৎপত্তি নিয়ে একটা দারুণ গল্প তিনি বলেছেন, কীভাবে এক বৃদ্ধ মানুষ মধু গেজিয়ে মদ তৈরি করেছিলো।

ধর্ম দর্শন আর মানুষের সভ্যতার সাথে মধু এভাবেই মিশে আছে। আর মিশে থাকবে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন।

▲গণস্বাস্থ্য

[লেখিকার অনুমতিসহ তাঁর ব্লগ থেকে]

ছবি নেট থেকে সংগৃহীত

বিশেষ ঘোষণা : ডায়ালাইসিস প্রতি সেসনের দর কমেছে

১লা বৈশাখ, ১৪২৮ (১৪ এপ্রিল, ২০২১) থেকে ধানমন্ডিস্থ গণস্বাস্থ্য ডায়ালাইসিস সেন্টারের সামাজিক শ্রেণীভিত্তিক বিভিন্ন চিকিৎসার পরিবর্তিত নতুন দর

নং	সামাজিক শ্রেণী	বর্হিঃ বিভাগের পরামর্শ ফি			A-V Fistula চার্জ	ইমার্জেন্সী ক্যাথেটার স্থাপন	স্থায়ী ক্যাথেটার স্থাপন	নতুন বছর থেকে ডায়ালাইসিসে দর আরও কমলো — ডায়ালাইসিস — ১-৩ শিফট (সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা)		৪র্থ শিফট (রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা)		ইমার্জেন্সী প্রতি সেসনে	দৈনিক কেবলমাত্র সিট ভাড়া — ওষুধ ও বিভিন্ন পরীক্ষার বিল আলাদা দিতে হবে				পরীক্ষা ও ওষুধসহ দৈনিক ICU চার্জ	কিডনী বায়োপসী পরীক্ষা	কিডনীর USG	নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা, রক্তে শর্করা (RBS), ক্রিয়েটিনিন, এলবুমিন, কেলসিয়াম, হিমোগ্লোবিন প্রভৃতি	ব্লাড পরিসঞ্চালন (Transfusion)
		Sr.GP	বিশেষজ্ঞ	Sr. বিশেষজ্ঞ				প্রতি সেসনে	সপ্তাহে তিনবার	প্রতি সেসনে	সপ্তাহে তিনবার		HDU Isolation	করোনা ওয়ার্ড	A/C কেবিন	ওয়ার্ড					
১	অতি দরিদ্র	ফ্রি		১০০	১৫০০	৪০০০	৫০০০	৬০০	১৪০০	৪০০	১০০০	১০০০	৫০০	ফ্রি	পাবেন না	ফ্রি	৫০০০	২০০০	ফ্রি	ফ্রি	ফ্রি
২	দরিদ্র	১০০	২০০	৩০০	৫০০০	৬০০০	১৫,০০০	৮০০	১৮০০	৫০০	১২০০	১৫০০	১০০০	৫০০	পাবেন না	ফ্রি	১০০০০	৩০০০	২০০	৮০০	৪০০
৩	নিম্ন মধ্যবিত্ত	২০০	৩০০	৪০০	৭০০০	৮০০০	১৮,০০০	১০০০	২২০০	৬০০	১৫০০	২০০০	১৫০০	৮০০	পাবেন না	৩০০	১৫০০০	৪০০০	৪০০	১০০০	৪৫০
৪	মধ্যবিত্ত	৩০০	৪০০	৬০০	১০,০০০	১০,০০০	২১,০০০	১৩০০	৩৫০০	১০০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	১২০০	৪০০০	৫০০	২০০০০	৫০০০	৫০০	১৫০০	৬০০
৫	উচ্চ মধ্যবিত্ত	৪০০	৬০০	৮০০	১২,০০০	১২,০০০	২৪,০০০	২০০০	৫০০০	১৫০০	৪০০০	৪০০০	৩০০০	১৫০০	৫০০০	৭০০	২৫০০০	৭০০০	৬০০	২০০০	৮০০
৬	ধনী	৫০০	৮০০	১০০০	১৪,০০০	১৪,০০০	২৬,০০০	২৫০০	৭০০০	২০০০	৫০০০	৫০০০	৪০০০	২৫০০	৬০০০	১০০০	৩০০০০	৮০০০	৭০০	২৫০০	৯০০
	গণ স্বাস্থ্যবীমা বিহীন	৬০০	১০০০	১২০০	১৬,০০০	১৬,০০০	২৮,০০০	২৫০০	৭০০০	২০০০	৫০০০	৬০০০	৫০০০	২৫০০	৭০০০	১২০০	৩৫০০০	১০০০০	৮০০	৩৫০০	১০০০

*** ICU/HDU/কেবিনে থেকে ডায়ালাইসিসের জন্য অতিরিক্ত ২০০০ টাকা যোগ হবে।**

কিডনী প্রতিস্থাপন (Transplant) উত্তম চিকিৎসা।

সামাজিক শ্রেণীভিত্তিক গণ স্বাস্থ্যবীমার একক এবং পারিবারিক দর

টঙ্গী, সাভার ও ঢাকা শহরে বসবাসকারীদের একক এবং বাৎসরিক প্রিমিয়াম

RT-PCR এবং এন্টিবডি পরীক্ষা

বাড়ি থেকে স্যাম্পল আনার জন্য অতিরিক্ত ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের অন্যান্য সেবা সমূহ উন্নতমানের কিন্তু খরচ আপনার সামর্থ্যের মধ্যে। বিভাগ সমূহঃ

* জেনারেল মেডিসিন * নেফ্রোলজী * কার্ডিওলজী * সাইকিয়াট্রিক মেডিসিন * জেনারেল সার্জারী * শিশু সার্জারী * শিশু ও নবজাতক * দন্ত বিভাগ * চক্ষু বিভাগ * নাক.কান.গলা * গাইনী এন্ড অবস * অর্থোপেডিকস * ফিজিওথেরাপী * আয়ূর্বেদ * আকপাংচার * চর্ম ও যৌন * ক্যান্সার বিভাগ * প্যাথলজী * ই.সি.জি. * ইকোকার্ডিওগ্রাফী * রেডিওলজী ও ইমেজিং বিভাগ * জেনারেল ও টি

হাসপাতালে ভর্তি ও ওষুধসহ প্যাকেজ চার্জের কয়েকটি উদাহরণ

নং	সামাজিক শ্রেণী	বাৎসরিক একক স্বাস্থ্যবীমা		বাৎসরিক পারিবারিক স্বাস্থ্যবীমা		এন্টিবডি পরীক্ষা	PCR পরীক্ষা	IOL চার্জ	চোখের Phaco চার্জ	বড় অপারেশন	মাঝারী অপারেশন	ছোট অপারেশন	নরমাল ডেলিভারী	সিজারিয়ান অপারেশন	অর্থোপেডিক/ নিউরো সার্জারী (ইমপ্লান্ট আলাদা)	Digital X-Ray	USG	ECG	Color ECHO	বিভিন্ন প্রকার রক্ত, CSF, Scrology, Micorobiology প্রভৃতি	ফিজিও থেরাপী
		অধুমপায়ী	ধুমপায়ী	অধুমপায়ী	ধুমপায়ী					অপারেশন, এনাসথেসিয়া ও ওষুধসহ প্যাকেজ											
১	অতি দরিদ্র	১০০	১২৫	২০০	২৫০	১০০	৫০০	৫০০	পাবে না	৫০০০	২০০০	ফ্রি	ফ্রি	২০০০	ফ্রি-২০,০০০	১০০	৫০	২৫	১০০	৫০	২৫
২	দরিদ্র	২০০	২৫০	৫০০	৬০০	১৫০	৭০০	১৫০০	পাবে না	১০,০০০	৫০০০	১০০০	৫০০	৫০০০	৩০০-২৫,০০০	২৫০	১৫০	৫০	৪০০	১০০-২০০	৫০
৩	নিম্ন মধ্যবিত্ত	৫০০	৬০০	১৫০০	১৭০০	২০০	১০০০	২০০০	৭০০০	১৫,০০০	১০,০০০	২০০০	১৫০০	১০,০০০	৪০০-৪০,০০০	৪০০	৩০০	১৫০	৮০০	২০০-৫০০	২০০
৪	মধ্যবিত্ত	১০০০	১২০০	২৫০০	২৮০০	২৫০	১৮০০	৩০০০	৯০০০	২০,০০০	১৫,০০০	৩০০০	২০০০	১৫,০০০	৫০০-৫৫,০০০	৫০০	৫০০	২০০	১২০০	৩০০-৮০০	৩০০
৫	উচ্চ মধ্যবিত্ত	১৫০০	১৭০০	৩০০০	৩৫০০	৩০০	২০০০	৩২০০	১০,০০০	২৫,০০০	২০,০০০	৫০০০	২৫০০	১৮,০০০	৮০০-৬০,০০০	৫৫০	৬০০	৩০০	১৫০০	৪০০-৯০০	৪০০
৬	ধনী	২০০০	২২০০	৪০০০	৪২০০	৩৫০	২২৫০	৩৫০০	১১,০০০	৩০,০০০	২৫,০০০	৬০০০	৩৫০০	২০,০০০	১০০০-৮০,০০০	৬০০	৭০০	৪০০	২০০০	৫০০-১০০০	৫০০
	গণ স্বাস্থ্যবীমা বিহীন	-	-	-	-	৪০০	২২৫০	৪০০০	১২,০০০	৫০,০০০	৩০,০০০	৭০০০	৪০০০	২৫,০০০	১০০০-১,০০,০০০	৭০০	৮০০	৫০০	২৫০০	৮০০-১২০০	৬০০

সেবা বৃদ্ধির জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে দান করুন।

পুনর্মুদ্রণ

বাংলাদেশ : আইন ও তার প্রয়োগ

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী
ট্রাস্টি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

[গত ১৮ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ ছিল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সিনিয়র স্বাস্থ্যকর্মী নিজাম উদ্দিন-এর ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। অবশ্য তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তৃণমূল পর্যায়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অগ্রযাত্রা রুখে দেবার জন্য স্বার্থান্বেষী মহলের রোষানলের বলী হয়েছেন নিজাম। যুগে যুগে গণমানুষের কল্যাণে নিবেদিত মানুষের অগ্রযাত্রা এভাবে থামিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সে-চেষ্টা কখনো সফল হয়নি। নিজামকে গলা কেটে খুন করেও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অগ্রযাত্রাও থামানো যায়নি।

এই দীর্ঘ ৪৫ বছরে দেশের স্বাস্থ্যখাতের খানিক উন্নতি হয়েছে, মানুষ আগের তুলনায় অধিক হারে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন কিন্তু সরকারি পর্যায়ে গরিব মানুষের চিকিৎসাসুবিধা সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। স্বার্থান্বেষী মহল আগেও ছিল, এখনও আছে। বরং বলা যায় বহাল তবিয়তেই তারা বিরাজমান। স্বাস্থ্যখাতের কেনাকাটায় তাই বিস্ময়কর তুঘলকি কাণ্ড চলে এবং সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ১৭টি নথি গায়েবের ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

নিজামের হত্যাকাণ্ডই শেষ হত্যাকাণ্ড নয়; হয়ত আরো জীবনের বিনিময়ে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। নিজাম হত্যাকাণ্ডের পূর্বাপর ঘটনা বিশ্লেষণ করে জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীর লেখাটি নিজাম উদ্দিন-এর স্মরণে পুনর্মুদ্রণ করা হলো। – স.]

নিজাম হত্যার পটভূমি

ডগরতলী গ্রামের আব্দুল বারিকের ছেলে নিজামুদ্দিনকে তার বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে শিমুলিয়া নতুন বন্দরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এখানেই নিজাম জন্মগ্রহণ করেছে এবং লেখাপড়া শিখেছে। মাত্র দু'বছরের মধ্যে এই এলাকায় নিজামের হত্যা ছিল কর্তৃপক্ষের জানা হত্যাকাণ্ডের মধ্যে অষ্টম। কর্তৃপক্ষের গোচরে নেই এমন হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা এর থেকেই অনুমেয়।

নিজাম হত্যার সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামকেন্দ্রিক মৌল সমস্যাগুলির একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। প্রায় ৭ লাখ একর খাস জমি উদ্ধারের জন্য সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কিছু সংখ্যক বিত্তবান গ্রামবাসী তা ভোগদখল করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি থানায় দেখা যায়, ১৯৪৮ সাল থেকে যে সকল হিন্দু ভারতে চলে গেছেন, তারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণের সম্পত্তি রেখে গেছেন। এই সকল সম্পত্তিকে সরকার শত্রুসম্পত্তি বলে ঘোষণা করেন আর প্রায়শই তা অবৈধভাবে দখল নিচ্ছে এরাই। একই ঘটনা অব্যবহৃত সরকারী দালানকোঠার ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ইউনিয়ন বীজ সংরক্ষণাগারের কথা বলা যায়। এই সকল দপ্তর যদি পুরোপুরি বেদখল নাও হয়, দেখা যায় দরজা-জানালাগুলি চুরি করে নিয়ে গেছে এবং এসব কাজও উপরোক্ত বিত্তবানদেরই কীর্তি। পেশাদার দুর্বৃত্তদের তারাই এ কাজে নিয়োগ করে।

শহীদ নিজামের এই হত্যাকাণ্ড গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের সামনে এমন একটি সমস্যা হাজির করেছে যা কেবল সামাজিক শান্তিকেই বিঘ্নিত করছে না, সামাজিক ন্যায়বিচারকেও সমূলে বিনাশ করছে। ঐতিহাসিকভাবে ধামরাই হচ্ছে এমন এক জায়গা, যেখানে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন তৈরি হতো। যারা তৈরি করতো তাদের শেষ তাঁতী পরিবারগুলো এখানে বসবাস করতো। আর শিমুলিয়া একাধারে এই ব্যবসায়ের কেন্দ্র এবং নদীবন্দর। এখান থেকে এই মসলিন কাপড় বিভিন্ন জায়গায় চালান হতো। ১৯৪৮ সালে বিত্তবান হিন্দুরা ভারতে চলে যাবার ফলে ধামরাইয়ের মসলিন ব্যবসার অকালমৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সেই সাথে নদীবন্দর হিসেবে শিমুলিয়ার গুরুত্বও লোপ পেতে শুরু করে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বেচাকেনার বাজার হিসেবে এর মর্যাদা এখনও অক্ষুণ্ন আছে। আর শিমুলিয়ায় বিত্তবান হিন্দুদের এককালের আবাসস্থল হবার ফলে এখানে অন্যান্য জায়গায় তুলনায় শত্রুসম্পত্তির পরিমাণ একটু বেশি। আর এইসব সম্পত্তি, যা ঘটে থাকে, মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক ব্যক্তি অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। কাগজপত্রে অনেক সময় বছরে মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে বিরাট মোটা অংকের সম্পত্তি লীজ দেওয়া হয়।

শুধু তাই নয়, শিমুলিয়া এবং ধামরাই কাঁসা-পিতলের কারবারের জায়গা হিসেবেও পরিচিত। এখানের সুবিধাভোগী শ্রেণীটি প্রায়ই হুণ্ডি করে টাকা পাচারের অবৈধ ব্যবসা করে। তারা নিজেদের প্রয়োজনে অপরাধীদের কেবল প্রশ্রয়ই দেয় না, যারাই সমাজবিরোধী তৎপরতায় বাধ সাধে, তাদের খতম করতেও ওদের দ্বিধা নেই। আর এই বিত্তবানদের পরিবারের লোক কিংবা জ্ঞাতি সীমান্তের উভয় পারেই থাকে বলে চোরাচালানসহ সব রকমের অবৈধ বেসাতির দরজা তাদের জন্য খোলা। পেশাদার খুনীদের সাহায্য সহযোগিতাও তাই প্রায়ই এদের দরকার হয়।

শিমুলিয়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুটি থানার মধ্যস্থলে তার অবস্থান। সাভার থেকে ১২ মাইল এবং ধামরাই থেকে সাড়ে ৫ মাইল – দু'দিকের দুই থানার হেডকোয়ার্টার থেকে এই নিরাপদ দূরত্বে থাকার ফলে শিমুলিয়া খুনী-ডাকাতদের অপকর্মের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। খুন হলো, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হলো, মামলা দায়ের হলো, তদন্ত অনুষ্ঠিত হলো - এতকিছুর পরেও দেখা

যায়, অভিযুক্ত আসামী বহাল তবিয়তে 'কিংবদন্তীর নায়ক'-এর মতো প্রকাশ্যে রাস্তায়-বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এইসব ক্রিমিনাল চরিত্রের লোকদের রীতিমত পোষে। প্রায়শই তারা হয় আতংকের কারণে অথবা কোন ব্যক্তিগত পার্থিব লাভের কথা ভেবে এদেরকে নিজেদের দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ করে। শিমুলিয়ার সোনা মিয়া, যার বিরুদ্ধে চার-চারটি খুনের মামলা এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে, রহস্যজনকভাবে শিমুলিয়ার চেয়ারম্যান আহমেদ আলীর দেহরক্ষী বনে গেছে এবং তার সম্পর্কে অনেক 'বীরত্বের' কাহিনী প্রচার করা হয়ে থাকে। আবার জাতীয় রাজনীতিবিদদেরও নির্বাচনের সময় আহমেদ আলীর মতো চেয়ারম্যানদের সাহায্য ছাড়া চলে না। ঠিক এভাবেই এই ভাড়া করা দেহরক্ষী এবং তার সহযোগী ও সাগরেদদের পদস্থ আমলা-অফিসারদের উপর সত্যিকার অর্থেই প্রচণ্ড প্রভাব বিদ্যমান। আর এক 'মিয়া' – সোনা মিয়ারই এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী ঠিক এই প্রভাবের জোরেই গোটা বাজারটির ইজারা লাভ করেছে এবং পরবর্তী সময়ে ব্যবসায়ীদের উপর কল্পনাতীত রকমে উচ্চ হারে তোলা 'নিরাপত্তা' ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়েছে এবং তা আদায় করে ছেড়েছে।

এই সকল সরকারী অফিসারদের জন্য তহশীলদারের কদর অনেক। এ কদর এজন্য যে, জমির রেকর্ড ও খাজনা সংক্রান্ত ব্যাপারে স্ব স্ব সুবিধা অনুযায়ী সাতকে পাঁচ এবং পাঁচকে সাত বানাবার কাজে তার অসীম ক্ষমতা রয়েছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ভূমি রাজস্ব প্রশাসন কমিটির এ সম্পর্কে অভিমত হচ্ছে, 'তহশীলদাররা সরকারী খাস জমিকে তাদের ব্যক্তিগত ভোগের সম্পত্তি হিসাবেই ব্যবহার করে এবং গোপনের নিজেদের বৈষয়িক লাভের বিনিময়ে বর্গা লাগায়। তারা (অতীত দিনের) জমিদারদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী এবং বিপজ্জনকও বটে। কারণ তাদের পেছনে রয়েছে সরকারী ক্ষমতা।' এমনি পরিস্থিতিতে শত্রু-সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত সম্পত্তি ফিরে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের সময়েই তার যাত্রা শুরু করেছিল 'বাংলাদেশ হাসপাতাল' নামের একটি ফিল্ড হাসপাতাল হিসেবে এবং ১৯৭২ সালে সেটি পুনঃ সংগঠিত হয় গ্রামভিত্তিক গণউন্নয়ন প্রকল্প ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র তাই গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করছে যাতে চিকিৎসার সামান্যতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত গ্রামগুলিতে একান্ত জরুরি নিতান্তই ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায় এবং অন্যান্য দিক থেকে পশ্চাৎপদ ও উপেক্ষিত এলাকাগুলিতে যৌথ প্রচেষ্টায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও লভ্য হয়ে উঠে।

থানা উন্নয়ন কাউন্সিল যার শীর্ষ পদে রয়েছেন মহকুমার এস.ডি.ও শিমুলিয়ার শত্রুসম্পত্তি বলে ঘোষিত একটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ পড়ো পড়ো বাড়ি আমাদের কাজের জন্য ব্যবস্থা (Allotment) দেন। এস.ডি.ও যথারীতি শিমুলিয়ার তহশীলদার গোকুলকে বাড়িটির মৌজা নম্বরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমাদের জানানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। তহশীলদার তা দিলেনও। কিন্তু আমরা যখন নির্দিষ্ট এলাকায় গিয়ে বাড়ির দখল নিতে চাইলাম, দেখা গেল তহশীলদার আমাদেরকে সম্পূর্ণ ভুল মৌজা নম্বর এবং ভ্রান্ত তথ্য দিয়েছে। এস.ডি.ও এ কথা জানার পরে তহশীলদারের উপর চটে যান এবং তার বদলীর আদেশ দেন। কিন্তু সে আদেশ কার্যকর করতে তিনি ব্যর্থ হলেন। এর ঠিক দেড় বছর পর এস.ডি.ও সাহেবই স্বয়ং বদলী হয়ে যান। আর তহশীলদার বহাল তবিয়তেই সেখানে থেকে যায়।

আমাদের জন্য এ্যালটকৃত বাড়িটি আমরা পাই ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনিকের যাবতীয় সরঞ্জাম সেখানে পাঠানো হয় এবং বাড়িটির মেরামতের কাজও শুরু করা হয়। শ্যামাচরণ নামের এক ব্যক্তি তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাসহ ক্লিনিক ভবনের পেছনের দরজায় বাস করতো। সেখানে তার দশ শতকের মতো জমিও ছিল, যা শত্রুসম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। আমরা চেয়েছিলাম ওখানে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ছাড়াও মাছের চাষ, পশুপালন ও কৃষিখামার চালুর ব্যবস্থাও আমরা করবো। সেহেতু আমরা শ্যামাচরণ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছিলাম যাতে সংলগ্ন জমিটুকু আমাদেরকে দেয়। ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে বাড়িটির পেছনের শত্রুসম্পত্তি বলে ঘোষিত জমিটি ক্রয় করার জন্য আমরা তার সঙ্গে দাম-দরের কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। শ্যামাচরণ ২,২০০ টাকায় জমি আমাদের দিতে সম্মত হয়েছিল। ২০ নভেম্বর, ১৯৭৬ তারিখে নিজাম এবং অপর তিনজন প্যারামেডিক কর্মী ঐ কেন্দ্রে থাকবে বলে তাদের সেখানে স্থায়ীভাবে চলে যাবার কথা ছিল। তারা তখনও ক্লিনিক ঘরেই থাকতো। কারণ তাদের আবাসিক কক্ষটি মেরামত করার কাজ তখনও শেষ হয় নি।

শুরুতে বাড়িটি যখন আমাদের নামে এ্যালট করা হয়, তখনই এলাকার একমাত্র পাশ করা ডাক্তার ইন্দুভূষণ (এল.এম.এফ) এই বাড়িটি আমাদের দেয়ার ব্যাপারে আপত্তি তুললেন এবং স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন। কারণ সম্ভবত ঐ এলাকায় তার ওষুধের ব্যবসা ছিল খুবই জমজমাট এবং তার ব্যবসা বিঘ্নিত হতে পারে আশংকায় তিনি ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র যাতে এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি। ইতিমধ্যে ইন্দুভূষণ সংক্ষিপ্ত এমবিবিএস কোর্সে পড়াশুনার উদ্দেশ্যে এলাকা ত্যাগ করলে তার অ-চিকিৎসক পুত্র তার ব্যবসা চালু রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

শিমুলিয়ায় ওষুধ বিতরণ ব্যবস্থাও বেশ লক্ষ্য করার মতো। নিজাম ঐ এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরেই প্যারামেডিক কর্মী হিসেবে কাজ করেছে। তবে কেবলমাত্র শেষ বছরটিতেই এলাকায় সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত ওষুধের ভাগ্যে কি ঘটছে তা খুঁজে দেখার কাজে সে হাত দিয়েছিল। একদিন এক লোক ওষুধ কেনার জন্য একটি ওষুধের দোকানে যান। তাকে তার নাম-ঠিকানা দেয়ার জন্য বলা হয়। ওষুধের দোকানদার তার নাম ও ঠিকানা একটা টুকরো কাগজে লিখে রাখেন। তবে তার বয়স সম্পর্কে কিছু

জিজ্ঞেস না করেই নিজে নিজেই বয়সের অংকটি বসিয়ে দেয়। সে এইসব নাম-ঠিকানা পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধ পৌঁছানো পর্যন্ত নিজের কাছে রেখে দিত। তারপর পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কম্পাউন্ডারের হাতে ঐ সকল নাম-ঠিকানার টুকরো কাগজ এবং কিছু টাকা গুজে দিয়ে তার বিনিময়ে ওষুধ নেয়া হতো। কম্পাউন্ডার অত্যন্ত যত্নের সাথে ঐ নাম-ঠিকানাগুলি তার রেজিস্টারে তুলে নিত, যাতে পরে কখনও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদারক করে দেখলে যেন দেখতে পান যে, যাদের ওষুধ দেয়া হয়েছে তাদের নাম, ঠিকানা পূর্ণ পরিচিতি রেজিস্ট্রারে রয়েছে। উক্ত দোকানদার স্বভাবতই চাইতো না যে, তার দোকানে ঐ ওষুধের বিরাট মজুদ বেশিদিন পড়ে থাক। সেইজন্য খুব সামান্য লাভেই ওষুধের একটা অংশ গ্রাম্য চিকিৎসকদের কাছে বিক্রি করে দিতো।

নিজাম নিখোঁজ

১৮ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিকালে নিজাম শিমুলিয়ার উদ্দেশ্যে সাইকেলে রওয়ানা হয়। তার ইচ্ছা ছিল সে পরের দিনই শ্যামাচরণকে সঙ্গে করে ফিরে আসবে এবং তার জমি ক্রয়ের দলিল রেজিস্ট্রির ব্যাপারটি চূড়ান্ত করবে। পূর্ববর্তী শনিবারই সে তার এ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, সে শুক্রবার ফিরে এলো না। শনিবার সকালে প্যারামেডিক কর্মীদের একটি টিম সঙ্গে নিয়ে ডাঃ কামাল শিমুলিয়া ক্লিনিকে যান। গিয়ে তারা আমাদের দারোয়ান রজব আলীর কাছে শুনতে পান যে, নিজাম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়ই সাইকেল যোগে শিমুলিয়া থেকে চলে এসেছে। চলে আসার সময় সে বলেছে, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাচ্ছে। শনিবার ক্লিনিকে বসে ডাঃ কামাল লক্ষ্য করলেন, সোনা মিয়া এসে ক্লিনিকে ঢুকলো এবং তার পরপরই আরেক ব্যক্তিকে দেখা গেল। পরের লোকটি নিজামের কথা জানতে চাইলে, সোনা মিয়া নিজেই একটু আগে এসেছে ঐ লোকটির দিকে ফিরে বলে উঠলো 'নিজাম নেই'। কামাল তার এই জবাবে হতভম্ব হয়ে যান। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সে বললো, নেই বলতে সে বুঝিয়েছে – সে আসে নি। পরের দিন রবিবার জানা গেল, নিজাম তার আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গেও নেই।

গ্রামবাসীরা চুপে চুপে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, যারা একবার নিখোঁজ হয়েছে, দেখা গেছে আসলে তাদের খুন করা হয়েছে। পুলিশ কিছুই করবে না। যদি কিছু করাতে হয়, তাহলে মিলিটারীর কাছে যেতে হবে।

২২শে নভেম্বর সোমবার আমাদের প্রকল্পের প্রশাসক সাভার থানার পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করলেন এবং তারই পরামর্শানুযায়ী সাভার থানায় একটি নিখোঁজ রিপোর্ট দিয়ে ডাইরি করানো হয় (জিডি নং-৭৭৮)। আমি ডাঃ কাসেমের পাঠানো জরুরি খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে জামালপুর থেকে ফিরে আসি এবং ২৪শে নভেম্বর সকালবেলা আমি ঢাকার ডেপুটি কমিশনার জনাব এ. এম. এম. শওকত আলীর সঙ্গে দেখা করি। এর আগে মঙ্গলবার দিন সাভারের পুলিশের কাছে আবারও যাওয়া হয়েছিল। যাই হোক, ডিসি জনাব শওকত আলী আমাকে কথা দিলেন যে, তিনি ঢাকার পুলিশ সুপারকে এই কেসে ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দেবার জন্য বলে দেবেন। ঐদিনই অর্থাৎ ২৪শে নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা আমাদের তিনজন প্রহরীকে সাথে নিয়ে পুলিশ শিমুলিয়া যায় এবং রজব আলীকে গ্রেফতার করে। কিন্তু আদুরানীকে তারা ধরতে পারলো না। সে নিকটেই কোথাও লুকিয়ে ছিলো।

২৫শে নভেম্বর আমি শিমুলিয়া পৌঁছেই আমাদের দারোয়ানদের কাছে আদুরানীর কথা শুনতে পাই। জানতে পাই সে দাবী করেছে যে, সে জানে নিজামকে খুন করা হয়েছে এবং বিষয়টি সবিস্তারে আমাকেই সে বলতে চায়। শুনে আমি তাকে বলি, এ কথা তাকে পুলিশের সামনে বলতে হবে। সে তখন বলে, সোনা মিয়া এবং তার সহযোগীরা খুবই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। তাই তার জীবিতাবস্থায় কখনই এ কথা থানায় গিয়ে বলা সম্ভব নয়। আমি বেলা ৩টার সময় একজন প্যারামেডিক কর্মীকে থানায় পাঠাই পুলিশকে ডেকে আনার জন্য যাতে তারা আদুরানীকে তখনই নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যখন দেখা গেল এক ঘণ্টার মধ্যেও পুলিশ আসছে না, তখন আমি আমার দারোয়ানদের নিয়ে তাকে থানায় পাঠিয়ে দিই। অবশ্য রাত ১১টার সময় পুলিশ এসেছিল। যাই হোক, ঐ রাতেই থানায় বসে রজব আলী ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে বিবৃতি দেয়। শুক্রবার সকালে তাদের দু'জনকেই পুলিশ শিমুলিয়া নিয়ে আসে এবং রজব আলী তার বিবৃতি অনুযায়ী সেই পরিত্যাক্ত পুকুরটি দেখায়, যেখানে নিজামের লাশ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। লাশের মাথা খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে লাশ খোঁজার সময় আমরা আরেকটি লাশের কঙ্কাল দেখতে পাই। ঐদিনই আমাদের কর্মীরা এবং দু'জন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের লোক একত্রে চেয়ারম্যান আহমেদ আলী ও মেম্বার মোমতাজ সহ কয়েকজনকে আটক করে এবং পুলিশে সোপর্দ করে। বলাবাহুল্য, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে তাদের সন্দেহ করা হচ্ছিল। রজব আলী ও আদুরানীর বিবৃতিতে যাদের নামোল্লেখ করা হয় সেইসব ব্যক্তি যথা : চেয়ারম্যানের দেহরক্ষী সোনা মিয়া, অজিত, রহমান, জগদীশ, আশু, নিরঞ্জন, ভজা, শংকর – এককথায় সবাইকে ঐদিন সকালে বাজারে দেখা গেছে। কিন্তু পুলিশ তাদের ধরতে পারলো না।

ঐ শুক্রবারেই সন্ধ্যায় পুলিশ গ্রামে টহল দিয়ে বেড়ালেও আর কাউকে গ্রেফতার করতে পারল না। তারা অবশ্য সোনা মিয়ার বাড়িতে যায় নি। এদিকে আমি পুলিশের যেসব লোক আসামীদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তাদের ফেরার অপেক্ষায় বসে ছিলাম। এ সময় ক্রন্দনরত রজব আলীর সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলছিলাম। সে এবং আদুরানী নিজমের হত্যাকাণ্ডের যে বর্ণনা দিয়েছিল, এখানে সেটাই হুবহু তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

হত্যার অঙ্গব্যবচ্ছেদ

বৃহস্পতিবার, ১৮ই নভেম্বর সকালে চেয়ারম্যান, মোমতাজ মেম্বার, চেয়ারম্যানের দেহরক্ষী সোনা মিয়া, জগাই (ওরফে জগদীশ), আশু (ওরফে আশুতোষ, ইন্দু ডাক্তারের পুত্র), পরিতোষ, মনোরঞ্জন বণিক, নিরঞ্জন, ভজা, রহমান, শংকর এবং আরও ১০ জন মিলে ক্লিনিকে একটি বৈঠক করে। তারা এই বৈঠকে কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছে তা রজব আলী জানে না। তবে তারা কথা প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ঐদিন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে কারোর

আসার কথা আছে কিনা অথবা নিজাম ঐদিন আসবে কিনা।

নিজাম ঐদিনই বেলা ৪টার দিকে শিমুলিয়া পৌঁছে এবং রজবকে বলে যে, সে রাতে ক্লিনিকে থাকবে। তারপর সে বাজারে যায় এবং সন্ধ্যা ৭টার দিকে ফিরে আসে। এর পরপরই সোনা মিয়া, ভজা ও রহমান ঘরে প্রবেশ করে। চেয়ারম্যান ও মোমতাজ মেম্বার তাদের সঙ্গে এলেও ঘরে না ঢুকে বাইরে একটি গাছের তলায় অপেক্ষা করতে থাকে। রজব তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল বলে সে তাদেরকে দেখেছিল। রজব তাদের সালাম জানায় এবং ভেতরে আসার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তারা না এসে শুধু বলে, তারা এখানেই অপেক্ষা করবে। ভেতরে যেসব কথাবার্তা হচ্ছিল রজব তাও শুনতে পাচ্ছিল। সে শুনলো, সোনা মিয়া নিজামকে বেয়াই বলে সম্বোধন করে সালাম জানালো। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকে চা খাওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে বাজারে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু নিজাম রাজী হলো না। সোনা মিয়া এবং অন্যান্যরা যাবার সময় আদুরানীকে বললো যে, তাকে মেলায় যেতে হবে। আদুরানী তার ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে চলে যায়। ইতিমধ্যে নিজাম একটি কাউন্টারের উপর শুয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করছিল। রজব বারান্দার পেছনে দাঁড়িয়ে শ্যামাচরণের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিল। এ সময় অর্থাৎ তাদের চলে যাবার প্রায় এক ঘণ্টা পর সোনা মিয়া অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে একটি চটের ছালা হাতে ফিরে আসে। তারা পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এবং ঢুকেই প্রথমে সামনের দরজা খুলে দেয়, যাতে আরো লোক ঘরে ঢুকতে পারে। এর ফলে ঘরে অনুপ্রবেশকারী লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩ জনের মতো। তারা মাত্র এক কোপে নিজামের গলা কেটে ফেলে। কাজটি এত দ্রুত তারা সম্পন্ন করে যে, নিজাম 'ও বাবা' বলে একবার মাত্র আর্তচিৎকার করা ছাড়া আর কোন শব্দই করতে পারে নি। রজব হকচকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সে এটা কি করছে ? জবাবে সে কিছুই বললো না। শুধু নিহত নিজামের পা দুটো তার হাত দিয়ে ধরতে নির্দেশ দিলো। সোনা মিয়াই প্রথম কোপ দিয়েছিল। এরপর সে নিজামের দেহ থেকে গলা আলাদা করার জন্য অস্ত্র চালিয়ে যেতে লাগলো। সাথে সাথে তার চারপাশের লোকদের এই কাজের যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। সে বললো, প্রথমতঃ এর ফলে লাশ দেখে কার লাশ তা শনাক্ত করা অসম্ভব হবে। এছাড়া ঘাড়ে অনেক নলি আছে। তার অর্থ হচ্ছে এর ফলে দেহের রক্তক্ষরণ দ্রুত শেষ হবে এবং রক্তক্ষরণ সম্পূর্ণ হলে হত্যার সময় নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হবে না। দেহ থেকে নিজামের গলা আলাদা করে ফেলার পর সে উপস্থিত সবাইকে তিরস্কার করে বলে, 'আহাম্মক সব, ওর লুঙ্গি, গেঞ্জি খুলে ফ্যাল। এইসব থাকলে এ দিয়েও শনাক্ত করা যায়।' এরপর সে রজবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সে তাকে নিজামের পা ধরতে দিয়েছিল। এর কারণ সে বুঝেছে কিনা? কোন জবাব দেবার আগেই সে বললো, এটা করা হলো এজন্য যে, এর ফলে রজবও এই খুনের অংশীদার হয়ে গেল। এখন যদি এই ঘটনার কথা সে কোথাও প্রকাশ করে, তাহলে তারও ফাঁসি হয়ে যাবে। তারপর সে রজবকে লক্ষ্য করে বলে, অবশ্য তুমি যদি কাউকে কিছুই না বলো তাহলে তোমার কিছুই হবে না। কারণ চেয়ারম্যান বাইরেই আছে। আর জানোই তো কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ঠিক এই রকম সময় আদুরানীকে বাইরে দেখা যায় এবং তাকে ভেতরে নিয়ে আসা হয়। এরপর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে হত্যাকারীরা সিগারেট ধরালো, বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বললো। নিজামের দেহ থেকে রক্তক্ষরণও শেষ হয়ে আসে এবং তার লাশটি বেঁধে ফেলা হয়। হাত দু'টি গুটিয়ে এনে বুকের উপর রাখা হয়। পা দু'খানাও গুটানো হয় এবং অত্যন্ত শক্ত করে হাঁটু ভেঙ্গে শেষ পর্যন্ত বুকের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়া হয়। এর নিজামের অসাড় দেহখানি একটি দুই মণের বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলা হয়। সত্যি কথা বলতে কি, এ রকম নৈপুণ্যের সাথে একটি মানবদেহকে এত সামান্য জায়গায় গুটিয়ে রাখা যায়, একজন ডাক্তার হিসেবে এতদিনের অভিজ্ঞতায় আমি কখনো এরূপ ঘটনার কথা শুনিনি, দেখা তো দূরের কথা। নিশ্চিতভাবেই এ কাজটি যে হাতের কাজ, সে এ কাজে অনেক দিনের অভিজ্ঞ। এরপর কয়েকজন লাশভর্তি বস্তাটি ধরে বাইরে নিয়ে যায়। তাদের চলে যাবার বিশ মিনিটের মধ্যে অন্যান্যরা ঘরটি পরিষ্কার করার কাজ সেরে ফেলে। ঘর পরিষ্কার করার কাজে আদুরানীকেও সাহায্য করতে বলা হয়। তাকে এও বলা হয় যে, এর ফলে আদুরানীও ঘটনায় শরীক হয়ে গেল। এখন যদি এই ঘটনার কথা কাউকে সে বলে দেয়, তাহলে তারও ফাঁসি হয়ে যাবে। এভাবে ঘর পরিষ্কার করার কাজ শেষ হলে তারা সবাই চলে যায়। যাবার সময় সোনা মিয়া নিজামের হাতঘড়ি ও সাইকেলটি নিয়ে যায়। অন্যরা নিজামের জামাকাপড় নেয়।

শুক্রবার সকালে সোনা মিয়া এবং অন্য দু'জন জায়গাটি ভাল করে পরখ করার জন্য ফিরে আসে। ঐদিন আবার তারা ঘটনাস্থল ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়। কাউন্টার ও দরজা প্রভৃতি গাবের ছোপ দিয়ে বার্নিশ করা হয়। তারপর তারা রজব আলীকে নিয়ে যেখানে নিজামের লাশ লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে যায় এবং তাকে তারা জায়গাটির উপর দশ দিন সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য বলে, যাতে ঐ সময় কোন কিছু জায়গাটির শান্তি বিঘ্নিত না করে। কারণ দশ দিন পরে লাশটি সম্পূর্ণভাবে শনাক্তকরণের অযোগ্য হয়ে পড়বে। আবারও তারা তাকে কাউকে কিছু বলার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দেয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় সোনা মিয়া এবং তার দুষ্কর্মের সহযোগীরা আবার ফিরে আসে। কিন্তু রজব এবার তাদের ঘরে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করে। তারা প্রায় প্রতি রাতেই আসতো। এমনকি বুধবার, যেদিন পুলিশ রজব আলীকে গ্রেফতার করতে আসে, সেদিনও তারা এসেছিল। আদুরানী সাধারণতঃ ছাদের উপর ঘুমাতো। তবে ঐদিন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ক্লিনিকের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছিল।

বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে

আমরা আটক করা সন্দেহভাজনদের নিয়ে শিমুলিয়া ছেড়ে থানা অভিমুখে রওনা দিলাম। এমন সময় অনেক গ্রামবাসীকে আমরা বলাবলি করতে শুনলাম, 'আপনারা কোনদিনই এইসব রুই-কাতলাদের ধরে রাখতে পারবেন না। কয়েক দিনের মধ্যেই

তারা ফিরে আসবে। আগামীকালই আতাউর রহমান (সাবেক মুখ্যমন্ত্রী) আদালতে হাজির হবেন চেয়ারম্যানের জামিনের আবেদন নিয়ে। আর তাতেও যদি না হয়, আহমেদ আলী চেয়ারম্যান মেডিকেল সার্টিফিকেটের জোরে বেরিয়ে আসবে।'

পথ চলতে চলতেই পুলিশ আমাদেরকে গ্রামবাসীদের মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে যে, আহমেদ আলী খুবই অসুস্থ। আমি তাকে পরীক্ষা করলাম এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দেখলাম। আমি জোর দিয়ে বললাম যে, যদি রাতে কোনভাবে তাকে অসুস্থ বলে মনে হয়, তাহলে হয় আমাকে অথবা কোন মিলিটারী চিকিৎসককে যেন ডাকার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই যেন বাজার থেকে মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে ক্রয়যোগ্য কোন চিকিৎসককে ডাকা না হয়।

যখন আমি এসব কথা বলছিলাম, তখন আরো অনেক ঘটনার কথা আমার মনে পড়লো। দিনের বেলা পুলিশ নিজামের বাবাকে বলেছিল যে, তার ছেলের লাশ মর্গে পাঠানোর সমস্ত ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। এ সময় আমি হস্তক্ষেপ করে বলি, তিনি খুবই দরিদ্র মানুষ। এমনিতেই সন্তানকে হারিয়ে শোকে কাতর, এর উপর যদি লাশ মর্গে পাঠানোর খরচ তাকে বহন করতে হয় – তাহলে সেটা হবে তার জন্য মস্ত শাস্তিস্বরূপ। নিশ্চিতই আইনে অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থার বিধান রয়েছে। নিজামের গ্রামের লোকেরা নিজামের লাশ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যন্ত নিয়ে আসার ব্যাপারে স্বেচ্ছায় রাজী হলো। সেখান থেকে নিকটবর্তী ক্যান্টনমেন্টের কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গ পর্যন্ত বিনা খরচায় নিজামের লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য পৌঁছে দিতে রাজী হলেন। পরের দিন আমাদের প্রকল্পের এ্যাম্বুলেন্স লাশ আনার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার, ডাঃ কামাল দেখতে পেলেন, যেসব পুলিশ আগের দিন লাশের সঙ্গে এসেছিল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারের কাছে তারা ৩৫০ টাকার একটি বিল তার প্রতিস্বাক্ষরের জন্য জমা দিয়েছে। উল্লেখ নিস্প্রয়োজন যে, এই বিল লাশ আনার খরচ বাবদ সংশ্লিষ্ট পুলিশরা দাবী করেছে। আমার এটাও মনে পড়লো, ডাঃ ইন্দুর ছেলে প্রদীপকে পুলিশ তার বাবার আহার্য ও খরচের জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করে আনতে বলেছিল। ডাঃ ইন্দুকে তখন জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশী হেফাজতে রাখা হয়েছিল।

পরের দিন শনিবার আমি সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঘটনাটি সম্পর্কে তাদের অবহিত করি। তারা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিষয়টি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের এখতিয়ারে তুলে দিলেন এবং ঢাকার পুলিশ সুপারকেও টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু জবাবে পুলিশ সুপার বললেন, সামরিক বাহিনীর লোকদের এই ঘটনায় খুব বেশি কিছু করার আছে বলে তিনি মনে করেন না। যাই হোক, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের মহাপরিচালক অবশ্য বললেন, যা ঘটেছে তার গুরুত্ব ও ভয়াবহতার বিবেচনায় তিনি মনে করছেন, তাদের অনেক কিছু করার আছে। পুলিশ সুপার কথা প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করলেন যে, আসামী মাত্র দু'জন এবং তারা উভয়েই ধরা পড়েছে। আমি দিব্য দেখতে পেলাম গ্রামবাসীদের আশংকা সত্যে পরিণত হতে চলেছে।

বিচার নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আশায় বুক বাঁধতে যা দরকার তা কি সাহস না নেহাৎ মূর্খতা? আজও আমি জানি না।

আমার স্মরণ আছে, নিজাম হত্যার দু'সপ্তাহ পর শুক্রবার আমি আমার দুই বন্ধুকে সাথে নিয়ে শিমুলিয়া গিয়েছিলাম। যে কাউন্টারে শায়িত অবস্থায় নিজামকে খুন করা হয়েছিল, সেই কাউন্টারের অভ্যন্তরে তখনও রক্তের দাগ দেখলাম। আমার মনে হলো, কাউন্টার, দেয়াল অথবা ওখানকার অন্য কোন সরঞ্জাম বা টুকিটাকি জিনিসগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্য আজ পর্যন্ত নেওয়া হয় নি। আমি বিস্মিত হয়ে ভেবেছি, রক্তের দাগ সম্বলিত কাপড়চোপড় ও চটের বস্তাটি এখন কোথায়। যদি সেগুলি এখন রাসায়নিকভাবে পরীক্ষা করা হতো ! ঠিক ঐ সময়েই যে কক্ষে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল তার এক কোণায় আমি একটি বড় দাও দেখতে পেয়েছিলাম। আমি এ তথ্যগুলি পুলিশকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত এগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে যাবার কোন গরজ তাদের কেউ বোধ করেন নি।

এখন আমি শুনতে পাচ্ছি, যে আহমেদ আলী চেয়ারম্যান ১৮ই নভেম্বর সকালবেলায় অনুষ্ঠিত বৈঠক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করে এসেছে, এখন সে বলছে যে, হ্যাঁ ঐদিন একটি বৈঠক হয়েছিল বৈকি ! তবে সেটা আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে। সত্যি লোকটি এই ধরনের খেলায় বহুদিনের পাকা খেলোয়াড়।

২১শে ডিসেম্বর গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের একজন প্যারামেডিক কর্মী খুনের অন্যতম আসামী শংকর চন্দ্র ঘোষকে ধরে ফেলে। শংকর মাত্র কিছুদিন আগে চেয়ারম্যান আহমেদ আলীর সাথে অন্য একটি খুনের মামলার আসামী হিসেবে খালাস পেয়েছে। সে অবশ্য দাবী করে, তার এই বেকসুর খালাস পাওয়ার জন্য তাকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। সে আরও বলেছে যে, সে চেয়ারম্যান আহমেদ আলীর সাথে কারাগারের অভ্যন্তরে একই ঘরে ছিল। আহমেদ আলী কিভাবে কারাগারের ডাক্তারকে নগদ নারায়ণের বিনিময়ে কিনে ফেলে এবং জেল হাসপাতালে জায়গা পায় তাও সে সবিস্তারে সবাইকে বলে। জেল হাসপাতাল এমন একটি জায়গা, যেখানে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বিত্তবান ব্যক্তিরা আরামে সময় যাপন করে থাকে। শংকরের অবশ্য এখানে আরাম করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি ছিল না।

চেয়ারম্যান প্রসঙ্গে কথা উঠতে সে হাসতে হাসতে একসময় এও বলে যে, আহমেদ আলী ম্যাট্রিক পাশ করেছে ১৯৭২ সালে, যে বছরে কেউই ফেল করার সুযোগ পায়নি। আর এভাবে ম্যাট্রিক পাশ করার পরই স্থানীয় স্কুল ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান বানানো হয় তাকে।

নিজাম হত্যার পরিকল্পিত চক্রান্ত সম্পর্কে শংকর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয় তা নিম্নরূপ :

নিজামকে খুন করার এক সপ্তাহ আগে সোনা মিয়া তাকে (শংকর) বলে যে, নিজাম যেহেতু ডাঃ ইন্দুর ব্যবসাকে তুলে দিতে

চাইছে সেজন্য তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া প্রয়োজন। নিজামের কার্যকলাপ এবং শিমুলিয়ায় তার উপস্থিতির কারণেই ডাঃ ইন্দুর রোগীর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছিল। ডাঃ ইন্দু এলাকার একমাত্র পাশ করা চিকিৎসক। আর সে কারণেই এই হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রামটির নেতৃত্বে ও ভোটের নিয়ন্ত্রণকারী একচেটিয়া মাতবর সে-ই। সোনা মিয়া শংকরকে আরও জানায় যে, ডাঃ ইন্দু নিজামকে খুন করার জন্য তাদেরকে সাত হাজার টাকা দেবে এবং এই টাকার জামিনদার হয়েছে মোমতাজ মেম্বার। মোমতাজ মেম্বার আবার ডাঃ ইন্দুর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার হিন্দু ভোটের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল।

খুনের মাত্র দু'দিন আগে অর্থাৎ ১৬ই নভেম্বর ডাঃ ইন্দুর বাড়িতে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে শংকর ও সোনা মিয়া উপস্থিত ছিল। তারা সেখানে গিয়ে দেখতে পায়, আহমেদ আলী চেয়ারম্যান, মোমতাজ মেম্বার এবং ডাঃ ইন্দু আগে থাকতে সেখানে হাজির রয়েছে। সেই বৈঠকেই চুক্তি হয় যে, নিজামকে খুন করার জন্য ডাঃ ইন্দু সাত হাজার টাকা দেবে এবং এই টাকা পরিশোধের জামিনদার হিসাবে থাকছে মোমতাজ মেম্বার। শংকরের কথা অনুযায়ী বুধবার ডাঃ ইন্দু ঢাকা চলে যায়।

বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ৮টার সময় সোনা মিয়া, শংকর, অজিত এবং মোমতাজ বাজারে মোমতাজের দোকানে গোপন শলাপরামর্শ করার জন্য একত্রিত হয়। সেখান থেকে তারা নিজাম যেখানে অবস্থান করছিল সেই উপকেন্দ্র ক্লিনিকে যায়। যাবার পথে ডাঃ ইন্দুর ছেলে আশু এবং অন্যান্যরা তাদের সঙ্গ নেয়। আশুই নিজামের লাশ চান মোহন ভৌমিকের (ইন্দু ডাক্তারের মেয়ের শ্বশুর) পরিত্যাক্ত পুকুরে লুকিয়ে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে শংকরের বিবৃতি এর আগে প্রদত্ত রজব আলী-আদুরানীর বিবৃতির সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়।

নিজামকে খুন করার দিন কয়েক পরে শংকর চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করে, এর পরে কি ঘটতে পারে। আহমেদ আলী জবাবে বলে, পুলিশ যদি আসেই, চেয়ারম্যান হিসাবে তারা তাকেই সবার আগে এ ব্যাপারে জানাবে বা জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ফলে সে জানবেই পুলিশ কি করছে এবং অন্যান্যদেরও প্রয়োজনীয় খবরাখবর দিতে পারবে। ডাঃ ইন্দু বলেছে পুলিশের মুখ বন্ধ করার জন্য যত টাকা লাগে সে দেবে। শুক্রবার যখন নিজামের লাশ উদ্ধার করা হলো, সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারম্যান সোনা মিয়া এবং দুষ্কর্মে তার অন্যান্য সহযোগীকে এই বলে খবর দেয় যেন তারা অবিলম্বে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কারণ পুলিশ তো আসছেই, সম্ভবতঃ মিলিটারীও আসবে।

গ্রামবাসীরা আমাদেরকে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত অপর একটি খুনের ঘটনা সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিল।

ঘটনার এক বছর পরে আদালতে এর বিচার পর্বটি শেষ হয়। চারজন লোক খুন হবার ঘটনা সংক্রান্ত এই মামলার আসামী হয়েছিল শংকর ও চেয়ারম্যান। সম্প্রতি মামলার রায়ে খালাস পেয়েছে তারা উভয়ে। চেয়ারম্যান মামলার ছয়জন সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের সাক্ষ্য সত্ত্বেও, সংশয়ের অবকাশের সুযোগ (অন দি বেনিফিট অব ডাউট) এবং একজন সহযোগীর অনুকূল বিবৃতির ফলে চেয়ারম্যান চার হত্যার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করে। এই মামলায় চেয়ারম্যান তার পক্ষে দু'জন সাক্ষীও হাজির করেছিল। দু'জনের একজন সাভার থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর। কিন্তু চেয়ারম্যানের এ সাক্ষীকে জেরা করা যায় নি। কারণ সে মামলার তদন্তকারী অফিসারও বটে। অপর সাক্ষীও একজন সার্কেল ইন্সপেক্টর, নাম কাজী মহীউদ্দিন, স্পেশাল ব্রাঞ্চের। তিনি খুনের ঘটনার সময় ঢাকার সার্কেল ইন্সপেক্টর হলেও ১৯৭১ সালে সাভারে ছিলেন। গ্রামবাসী লোকজনের মত হচ্ছে যে, তিনি আহমেদ আলীর অনুকূলে সাক্ষ্য দেবার জন্য মাত্র পনের হাজার টাকা নিয়েছেন। সাক্ষ্যপ্রদান সংক্রান্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন, খুনের ঘটনার রাতে তিনি সাভারে ছিলেন এবং তার সঙ্গে আহমেদ আলী ঢাকায় আসে। তিনি আহমেদ আলীকে গাড়ি থেকে ঐদিনই রাত ১০টার দিকে ঢাকা কলেজের কাছে নামিয়ে দেন কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করা হলো না – তাকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হতে আর কে দেখেছিল? সাভারে আর কার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল? কোন গাড়িতে তিনি গিয়েছিলেন? সে গাড়ির চালক কে ছিল? সেই রাতে কি উদ্দেশ্যে তিনি সাভার গিয়েছিলেন, তার সাভার গমনের কোন অফিসিয়াল রেকর্ড (তার নিজের একান্ত ব্যক্তিগত ডায়েরি সহ) আছে কিনা, ঢাকা কর্তৃপক্ষ তার এই সাভার গমন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কিনা? গাড়ির লগ বই পরীক্ষা করা হয়েছিল কি? গাড়ির চালককে জেরা করা হয়নি কেন? কেউই এসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার কোন গরজ অনুভব করেন নি। এর পরেও এই সাক্ষীর বক্তব্য অন্য ছয়জন সাক্ষীর বক্তব্যের তুলনায় বেশি বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হলো। অন্যদের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য গণ্য হলো না। কারণ এই মামলার আসামীপক্ষের এডভোকেট ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও এককালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান

উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সদিচ্ছার কথা অস্বীকার করার প্রশ্ন উঠে না। তবে এটাও ভাবতে আমরা অভ্যস্ত যে, ইনসাফের দাবী অস্বীকার করা চলে না। এই দুনিয়ার মালিকানা গরিব মানুষের নয়। যেভাবেই হোক, শার্ট, টাই ও ট্রাউজার পরিহিত মানুষের কথা সর্বত্র বেশি মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। পুলিশ তার অনুকূলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে, বিত্তশালী অপরাধী শাস্তি তো পাবেই না বরং অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করবে। আর মহামান্য আদালত নিরক্ষর লোকদেরই ফাঁসিতে লটকাবে। তাই বর্তমান আইন-আদালত ব্যবস্থার কাছ থেকে নিরক্ষরদের বেশি কিছু আশা করার নাই। বলাই বাহুল্য, প্রচলিত আইন-আদালত ব্যবস্থা পরিচালিত হয় এমন সব আইনজীবী, জজ, পুলিশ এবং সরকারী আমলাদের দ্বারা যারা জন্মসূত্রে, বৈবাহিক সম্পর্ক সূত্রে অথবা নগদ প্রাপ্তি যোগের মাধ্যমে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে গ্রামীণ বৃহৎ ভূ-স্বামী ও আহমেদ আলীর মতো লোকদের সঙ্গে বাঁধা। আর এমনটি ঘটে আসছে যুগ যুগ ধরে।

▲গণস্বাস্থ্য

মাসিক গণস্বাস্থ্য, ৩৬ বর্ষ ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪

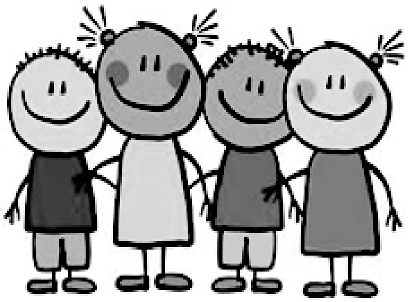

শিশু-কিশোর বিভাগ

'মাসিক গণস্বাস্থ্য' পত্রিকায় একসময় 'ছোটদের পাতা' নামে একটি বিভাগ ছিল এবং প্রতি সংখ্যাতেই বিভাগীয় লেখা নিয়ে পাঠকদের সামনে উপস্থিত হতো। ছোটদের কাছেও বিভাগটি যথেষ্ট প্রিয় ছিল। নানা কারণে দীর্ঘকাল এই বিভাগ আমরা চালু রাখতে পারিনি। কিন্তু শিশু-কিশোর পাঠকদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে এখন থেকে 'শিশু-কিশোর' বিভাগটি নিয়মিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-ধাঁধা ইত্যাদি নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হবে। শুধু তা-ই নয়, যাদের জন্য এই বিভাগ; তারাও এতে লেখা, অংকের ধাঁধা, কোন বিজ্ঞান যাদুঘর দেখে তার বয়ান বা এ রকম কিছু বিষয়ের ওপর লিখে নিজেরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে। আপাতত এর জন্য দুটি পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হলেও আগামীতে তোমাদের আগ্রহের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে।

*এই বিভাগটি সার্বিকভাবে দেখাশোনা করবেন **অনুসন্ধিৎসু চক্র** বিজ্ঞান সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য **ড. আমানুল ইসলাম**। তোমরা ইচ্ছে করলে তাঁর কাছে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন করতে পারো। প্রশ্ন গৃহীত হলে প্রশ্নকর্তার নামসহ উত্তর ছাপা হবে।*

মাথায় কত প্রশ্ন আসে!

আকাশে ধ্রুবতারা (পোল স্টার) কেন স্থির থাকে?

খালি চোখে রাতের আকাশ ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে – তারাগুলো নির্দিষ্ট সময় পর আর আগের অবস্থানে থাকে না। শুধু একটি তারার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঘটে না। এটি হচ্ছে ধ্রুবতারা। কিন্তু কেন? বিষয়টিকে আমরা একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারি। পরীক্ষাটি করার জন্য দরকার হবে একটি কক্ষ, বল ও কিছুটা দড়ি।

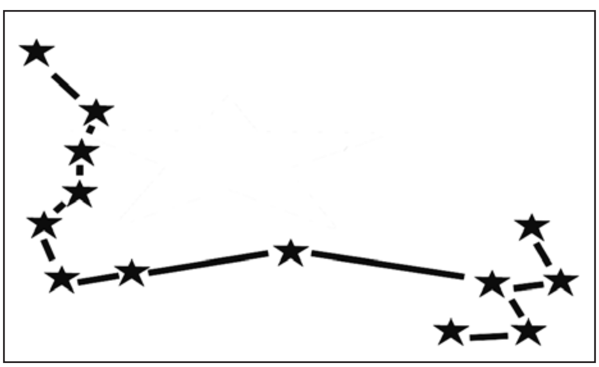

প্রথমে কক্ষের ছাদ থেকে বলটিকে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হবে। ঠিক যে বরাবর বলটি ঝুলছে তার নিচে মেঝেতে একটি দাগ দাও। দাগাঙ্কিত স্থানে এসে দাঁড়াও আর চারপাশ লক্ষ্য কর। তুমি এখন সরাসরি বলটিকে তোমার উপরে দেখতে পাচ্ছো। চিহ্নিত স্থানে দাঁড়িয়ে বলের দিকে চোখ রেখে ঘুরতে থাকো। দেখতে পাচ্ছো কক্ষের সব কিছুই ঘুরছে। শুধু মাথার উপরে থাকা বলটি ছাড়া সব কিছুই ঘুরছে। তুমি যেদিকে ঘুরছো সব কিছুই তার বিপরীত দিকে ঘুরছে বা সরে যাচ্ছে। তাহলে মূল ব্যাপারটি হলো, কোন বস্তু (মাথার উপরে থাকা বল) যদি ঘূর্ণনের অক্ষ (তোমার শরীর) বরাবর অবস্থান করে তাকে ঘুরতে দেখা যাবে না। ধ্রুবতারা যেহেতু পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ (অর্থাৎ যে-রেখাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরে চলেছে) রেখার ওপর অবস্থিত তাই পৃথিবীর উপরস্থ যে কোনো বিন্দুর সাপেক্ষে তার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। সারা দিন বা সারা বছরের সব কটা দিনে তাকে একই অবস্থানে দেখা যাচ্ছে।

সব রক্তই লাল নয়

রক্তের কথা ভাবলেই শরীরে প্রবাহিত লাল বর্ণের তরলের কথা মনে পড়ে যায়। অবাক ব্যাপার হলো, জীবনদায়ী এই তরলটি প্রাণীর ভিত্তিতে নানা বর্ণের হতে পারে। কখনো নীল, কখনো বেগুনি, সবুজ কিংবা হতে পারে বর্ণহীনও। রক্তে প্লাজমা প্রোটিন নামক বিশেষ প্রোটিনে বিদ্যমান বিভিন্ন রাসায়নিকের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে বর্ণে বৈচিত্র্য দেখা যায়।

নীল রক্ত : অশ্বখুর কাঁকড়া, গলদা চিংড়ি, কিছু প্রজাতির অক্টোপাস, মাকড়সায় এ ধরনের রক্তের দেখা মেলে। তামা সমৃদ্ধ রক্ত প্রোটিন হিমোসায়ানিনের উপস্থিতি এই বর্ণের কারণ।

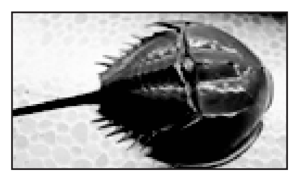
অশ্বখুর কাঁকড়া

সবুজ রক্ত : এ ধরনের রক্ত কেঁচো, জোঁক, সামুদ্রিক কৃমি, স্কিন্‌ক (গিরগিটি ধরনের প্রাণী)-এ দেখা যায়। এসব প্রাণীর রক্ত প্রোটিনে ক্লোরোক্রোরিন নামক রঞ্জকের উপস্থিতি এই বর্ণের কারণ।

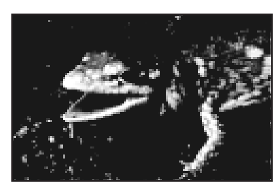
স্কিন্‌ক

বেগুনি রক্ত : কিছু সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন ব্রাকিওপড, পেনিস ওর্ম, পিনাট ওর্ম এ ধরনের রক্ত দেখা যায়। রক্ত প্রোটিনে হিমোইরিথ্রিনের উপস্থিতির কারণে এমনটা হয়।

ব্রাকিওপড

লাল রক্ত : মানুষসহ প্রায় সব ধরনের মেরুদন্ডী প্রাণীর রক্ত লাল। রক্তের লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির জন্য তা লাল দেখায়। হিমোগ্লোবিন লৌহ সমৃদ্ধ শ্বাস প্রশ্বাস প্রোটিন।

স্বচ্ছ বা বর্ণহীন রক্ত : আইস ফিসে এমনটি দেখা যায়। এদের রক্তে কোন শ্বসনিক প্রোটিন নেই।

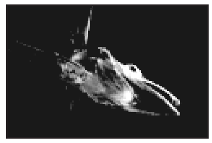

আইস ফিস

স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিয়ে কিছু কথা

রঙেই গুণের পরিচয়!

সুস্থ-সবল থাকতে কে না-চায়। স্বাস্থ্যবান থাকতে শিশু-কিশোরদের প্রতিদিনই বাহারী রঙের ফল ও শাকসবজি খাওয়া প্রয়োজন। কোন একক ফল বা সব্জি থেকে প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় না। একেকটির গুণ একেক রকমের। উদ্ভিদ জগতে অন্তত নয়টি বিভিন্ন গোত্রের ফল ও শাকসবজি রয়েছে: যাতে বিদ্যমান শত রকমের বিভিন্ন উদ্ভিদ যৌগ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। দেখা গেছে ফল ও শাকসবজিতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান এবং ফাইটোরাসায়নিক (Phytochemical)-এর সাথে তাদের বর্ণের সম্পর্ক রয়েছে। তাই এদেরকে পাঁচটি ভিন্ন বর্ণের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বেগুনি

এই রঙ ধারণকারীদের জারকরোধী (Antioxident) বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ক্যান্সার, হৃদআক্রমণ ও হৃৎপিন্ডের রোগের ঝুঁকি হ্রাস করে। উদাহরণ : বীট পালং, লাল বাঁধাকপি, বেগুন, ব্লাকবেরি, ব্লুবেরি, বরই, প্যাসনফল

লাল

এই রঙ ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক এবং হৃৎপিন্ডের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করে। উদাহরণ : লাল ক্যাপসিকাম, টমেটো, লাল আপেল, চেরি, লাল আঙ্গুর, স্ট্রবেরি, তরমুজ।

কমলা/হলুদ

এধরনের ফলমূলে উপস্থিত ক্যারটিনয়েড (Ceratinoid) চোখের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে।
উদাহরণ : গাজর, কুমড়া, স্কোয়াশ, এপ্রিকট, লেবু, আম, বাঙ্গি, কমলালেবু, পেঁপে, আনারস

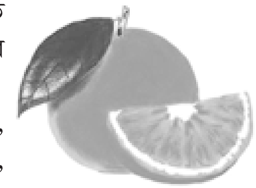

বাদামী/সাদা

এগুলোতে ভাইরাসরোধী ও ব্যাকটেরিয়ারোধী ফাইটোরাসায়নিক থাকে। সাথে পটাসিয়ামও।
উদাহরণ : ফুলকপি, রসুন, আদা, পেঁয়াজ, কলা, কাঁঠাল, বাদামী নাশপাতি

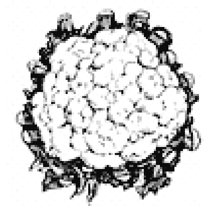

সবুজ

ক্যান্সাররোধী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ফাইটোরাসায়নিক রয়েছে।
উদাহরণ : এসপারাগাস, সবুজ শিম, ব্রকোলি, বাঁধাকপি, সবুজ ক্যাপসিকাম, শসা, লেটুস, মটরশুটি, পালংশাক, সবুজ আপেল, এভোকাডো, আঙ্গুর, লেবু।

জানা অজানা

কার ঘ্রাণশক্তি বেশি?

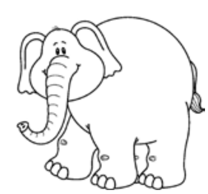

হাতির অলফ্যাক্টরী রিসেপ্টর জিন (Olfactory Receptor Gene তথা ঘ্রাণেন্দ্রিয়)-এর সংখ্যা ১,৯৪৮টি। এই জিন পরিবেশে থাকা ঘ্রাণ সনাক্ত করে। ইঁদুরে এই জিনের সংখ্যা ১২০৭টি, কুকুরে ৮১১টি আর মানুষে ৩৯৬টি। বিজ্ঞানীরা বলছেন হাতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিমাণ জিন ঘ্রাণকার্যে নিয়োজিত।

কতটুকু পানি দরকার হয়?

যেকোন উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই পানি প্রয়োজন। ফলমূল থেকে আলুর চিপস – সব কিছুতেই। ১টি হামবার্গার তৈরিতে ২৪০০ লিটার পানি দরকার হয়। এক কাপ কফি বাগান থেকে টেবিল পর্যন্ত পৌঁছাতে খরচ হয় ১৪০ লিটার পানি। ১টি আলুর চিপস তৈরিতে ১৮৫ লিটার, ১টি আপেল উৎপাদনে ৭০ লিটার ও ১টি টমেটো উৎপাদনে ১৩ লিটার পানির প্রয়োজন হয়।

ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

এম এ মোমেন

'পেছন ফিরে দেখুন এবং স্মরণ রাখুন এমন কোনো সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে না দু'দিন আগে বা পরে যার পতন ঘটবে না।' পৃথিবীর সর্ববৃহৎ করপোরেট ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অ্যাল স্টুয়ার্ট এ কথাই বলেছেন তাঁর *দ্য হিস্ট্রি অব ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি: দ্য হিস্ট্রি ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড* গ্রন্থে।

এ কোম্পানির একদা জুনিয়র অফিসার, পরে দুই টার্মের গভর্নর জেনারেল য়ান পিটার্সজুন কোয়েন (১৫৮৭-১৬২৯) প্রশাসনিক দক্ষতা, বাণিজ্যিক সক্ষমতা এবং ভয়ংকর নির্মমতার উদাহরণ। তিনি বলেছেন, 'হতাশ হবে না। শত্রুকে কখনো ছাড় দেবে না। কারণ ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন।' অস্ত্র ও বোমার কারখানাগুলোকে যদি বাদ দেয়া হয় তাহলে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো বিপুলসংখ্যক হত্যাকাণ্ডের দায় নেই অন্য কোনো কোম্পানির। য়ান পিটার্সজুন যেমন বলেছেন শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিত করে দিয়েছেন। এটিই পৃথিবীর প্রথম বৃহত্তম কোম্পানি।

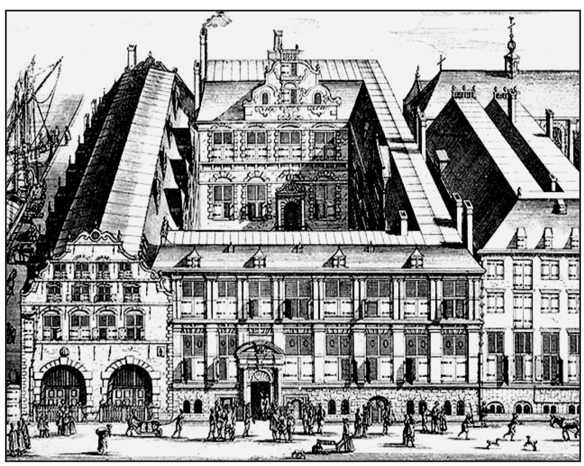

ক. এটিই পৃথিবীর প্রথম মাল্টিন্যাশনাল/ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানি,

খ. এ কোম্পানির প্রথম আইপিও (ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং) ঘোষণা করে।

গ. প্রথম স্টক ইস্যু করে এবং কোম্পানি হিসেবে দেউলিয়াও হয়ে যায়।

ঘ. পৃথিবীর প্রথম মেগা করপোরেশন, যা সরকারের অনেক ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যেমন যুদ্ধ ঘোষণা করা, কারাদণ্ড দেয়া, অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড দেয়া, মুদ্রা তৈরি ও উপনিবেশ সৃষ্টি করা।

ঙ. বৈশ্বিক পুঁজিবাদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

চ. করপোরেট উন্নয়ন এবং শোষণ উভয়েরই প্রতীক এ কোম্পানি।

তিনটি এক পঙ্‌ক্তির ডাচ কৌতুকের প্রশ্ন ও উত্তর ডাচদের চরিত্র ব্যাখ্যা করে।

প্রথম প্রশ্ন : ডাচরা এত লম্বা কেন?

উত্তর : বাঁধ ভেঙে পানি ঢুকলে নাক উঁচিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

দ্বিতীয় : প্রশ্নটি একই – ডাচরা এত লম্বা কেন?

উত্তর : খাটোগুলো পানিতে ডুবে মারা গেছে।

তৃতীয় প্রশ্ন : ডাচদের নাক এত লম্বা কেন?

উত্তর : বাতাসের অক্সিজেনের জন্য তো আর পয়সা খরচ করতে হয় না। প্রথম উত্তরটিতে ডাচদের অভিযোজন দক্ষতার প্রমাণ মেলে, দ্বিতীয়টিতে সারভাইবাল অব দ্য ফিটেস্ট – ডাচরা নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকে আর তৃতীয়টিতে কষ্ট বিনে পয়সা বা স্বল্প পয়সায় লাভের জন্য ডাচরা চেহারাও বদলে ফেলতে পারে।

পশ্চিম ইউরোপে নর্থ সির তীরবর্তী নেদারল্যান্ডসকে অতিকায় বাঁধ, ডাইক নির্মাণ করে সমুদ্রের ঝাপটা ঠেকিয়ে টিকে থাকতে হয়েছে, সমুদ্রগামী ডাচদের বাণিজ্যিক সিন্ডিকেট ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্টি করেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যারিটাইম সাম্রাজ্য এক বিশাল প্রকৃতির বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য স্থাপনের সক্ষমতা এমনকি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরও ছিল না। আর প্রতিযোগিতায় এবং বৈশ্বিক দলাদলির এ যুগে ম্যারিটাইম সাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে।

বয়সে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চেয়ে দুই বছরের ছোট ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির (Vereering Ostindisehe Compagnie Voc) ১৬০২ সালে সরকারের সনদ দিয়ে একটি বৈশ্বিক কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে জলদস্যুর নির্মমতা নিয়ে বাণিজ্য বিস্তার করে। প্রায় চার শতক আগে ৭০ হাজার বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী নিয়োগ করে এটি অবিশ্বাস্য আকারের একটি করপোরেটে পরিণত হয়। নতুন সহস্রাব্দে কোম্পানি মার্জারের (একীভূতকরণ) যুগেও সম্পদের হিসাব কোনো কোম্পানিই ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি।

অ্যাপল, মাইক্রোসফট, অ্যামাজন, এক্সন মবিল ও ওয়েলস ফার্গো একত্র করে একটি কোম্পানি দাঁড় করালে তা ডাচ ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানির সমান হবে। বলা প্রাসঙ্গিক, এখনকার জাপান ও জার্মানির সামগ্রিক জিডিপি এই ডাচ কোম্পানির তুল্য।

ডাচ কোম্পানির ম্যারিটাইম বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের একটি চিত্র কল্পনায় আনতে চাইলে বিশ্ব মানচিত্রে নিচের ভৌগোলিক অবস্থানগুলোকে রেখা টেনে সংযুক্ত করতে হবে।

ইউরোপ : আমস্টারডাম (বৈশ্বিক সদর দপ্তর) ডেলফট, হর্ন, মিডলবার্গ রটারডাম।

আফ্রিকা : ডাচ মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকা – ডাচ কেইপ কলোনি।

এশিয়া : ইন্দোনেশিয়া – বাটাভিয়া, ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ।

ভারত উপমহাদেশ : ডাচ করোমানডেল, ডাচ সুরাট, ডাচ বেঙ্গল, ডাচ সিলন, ডাচ মালাবার।

জাপান : হিরোডো, নাগাসাকি, ডেজিমা।

তাইওয়ান : আনপিঙ্গ, তাইদান, ওয়াঙ আন।

মালেয়েশিয়া : ডাচ মালাক্কা।

থাইল্যান্ড : আইয়ুথায়া।

ভিয়েতনাম : খ্যাঙ্গ লং হোই আন।

বর্ধিত স্থানগুলোর মধ্যবর্তী সমুদ্রসীমানার তীরের প্রায় সমস্ত শহর ডাচ কোম্পানির বাণিজ্যের আওতায় এসে যায়।

ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিশ্বায়নের একটি নমুনা : বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রেমব্রান্ট কিংবা ভারমিয়ার কখনো নিজ দেশের সীমান্ত অতিক্রম করেননি। কিন্তু কোম্পানি পূর্বকে পশ্চিমে এনে দিয়েছেন। এচিংয়ের জন্য রেমব্রান্ট ব্যবহার করতেন কোম্পানির বাজারজাত করা জাভানিজ ব্লেড আর চিত্রকলার ডাচ গোল্ডেন এজের সব প্রিন্ট নেয়া হয়েছে জাপানি কাগজে। চীন ও জাপানের পোর্সেলিন পাত্র ছবি হিসেবে উঠে এসেছে ভারমিয়ারের চিত্রকলায়।

কোম্পানির উত্থান

বিশ্ববাণিজ্যের মূল আকর্ষণ ছিল মসলা। মরিচ, দারচিনি, আখরোট ইত্যাদির টানেই পর্তুগিজ বণিক ও জলদস্যুদের আগমন। তাদের অনুসরণ করে ইংরেজ, ডাচ ও ফরাসিরা। পর্তুগিজদের মনোপলি সফলভাবে ভেঙেছে ডাচরা। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬০০ সালে, ১৬০২ সালে গঠিত হয় ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬০৩ সালেই কোম্পানি পর্তুগিজ অধিকার থেকে সান্তা ক্যাটেরিনা দখল করে এবং ১৬০৬ সালে প্রথম ইউরোপীয় জাহাজের অস্ট্রেলিয়া গমন। এটি কোম্পানির জাহাজ, নিয়ে যান ভিলেস য়ানসুন। ১৬০৯ সালে কোম্পানি নিউইয়র্ক পৌঁছে। ১৬১৬ থেকে ১৬২৫-এর মধ্যে ডাচ সুরাট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে অবস্থান সংহত করে। ১৬২৪-এ পৌঁছে তাইওয়ান। ১৬২৭ থেকে ১৮২৫ সময়ে প্রতিষ্ঠা করে ডাচ বেঙ্গল। ১৬৩৬-৩৭ সালের কোম্পানির টিউলিপ ম্যানিয়াই অর্থনীতির ইতিহাসে প্রথম দলিলীকৃত অর্থনৈতিক বুদ্বুদ। ১৬৩৮ থেকে ১৬৫৩-এর মধ্যে ডাচ মরিশাস, ডাচ সিলন, ডাচ মালাক্কা স্থাপন ও জাপানের একাংশে বাণিজ্য সম্প্রসারণ। ১৬৪৩-৪৪-এ কম্বোডিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ, ১৬৪৬-এ ফিলিপাইনের সঙ্গে যুদ্ধ এবং ১৬৫২ থেকে ১৬৫৪ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ। ১৬৫২ সালে কোম্পানি দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপটাউন শহরের গোড়াপত্তন করে। এরপর মালাবারে অবস্থান তৈরি। ১৬৬৭-৭৪ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তৃতীয় যুদ্ধ। ১৬৯৬ সালে এশীয় অঞ্চলে কফি চাষ; ১৭০৪ জাভার সাথে যুদ্ধ; ১৭৪০ সালে বাটাভিয়া হত্যাকাণ্ড, ১৭৬৭ সালে ক্রীতদাস বিদ্রোহ মোকাবেলা; ১৭৮০-৮৪ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে চতুর্থ যুদ্ধ এবং ডাচদের চূড়ান্ত পরাজয়। ১৭৯৬ সালে কোম্পানির জাতীয়করণ, ১৭৯৯ কোম্পানির অবসায়ন ও আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি।

ডাচ কোম্পানির নির্মমতা

পৃথিবীর প্রথম বৃহত্তম করপোরেট ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বর্বরতার কুখ্যাতি অর্জন করে আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে বিদায় নিতে হয়েছে। কোম্পানির কালো ইতিহাসে জড়িত কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করতেই হয়। এর মধ্যে রয়েছে বাটাভিয়া হত্যাকাণ্ড ১৭৪০, অ্যামবয় হত্যাকাণ্ড ১৬২৩, কান্দা দ্বীপপুঞ্জ হত্যাকাণ্ড ১৬২০ এবং ল্যামি দ্বীপ হত্যাকাণ্ড ১৬৩৬। বাটাভিয়া হত্যাকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করা হচ্ছে।

ডাচ কোম্পানির ইস্ট ইন্ডিজ (এখনকার ইন্দোনেশিয়া) ঔপনিবেশিকীকরণের এবং বাটাভিয়ার (জাকার্তা) নগরপত্তনের শুরুতে চীনা শ্রমিকরা এসে কাজে যোগ দেয় এবং তারা একটি চায়না টাউন গড়ে তোলে। ডাচদের বাণিজ্য সাফল্য ও বাটাভিয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ অভিবাসী হওয়ার জন্য আকৃষ্ট করতে থাকে।

১৭৩০-এ দশকে ইস্ট ইন্ডিজে ম্যালেরিয়া মহামারী শুরু হলে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের গভর্নর জেনারেল ডিরেক ভ্যান ক্লুনও ম্যালেরিয়ায় মারা যান। সন্দেহ করা হয়, চীনাদের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া সংক্রমিত হচ্ছে এবং অনেক চীনারা এখনো জীবাণু বহন করছে। ডাচদের এ ধারণায় সমর্থন জোগায় স্থানীয় বাটাভিয়ানরা।

সন্দেহভাজন চীনাদের জাহাজে তুলে দারচিনি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীলংকা পাঠানো শুরু হয়। কিন্তু গুজব রটে যায় জাহাজ জাভার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেই এ চীনাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। ডাচ অফিসাররা চীনাদের বিভিন্নভাবে শোষণ করে এবং নির্মম শাস্তি প্রদান করে। ক্রোধ জমে জমে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন পেশার চীনা শ্রমিক বিশেষ করে ইক্ষু শ্রমিকরা ৭ অক্টোবর ১৭৪০ সমবেত হয়ে ৫০ জন ডাচ সৈন্যকে হত্যা করে। এর প্রতিশোধ নিতে সশস্ত্র ডাচ বাহিনী চায়না টাউন ঘেরাও করে বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ১০ হাজারেরও বেশি চীনাকে হত্যা করে। হাতে গোনা কিছুসংখ্যক চীনা বেঁচে যায়।

ঔপনিবেশিকীকরণের ইতিহাসে এমন পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তেমন বেশি নেই। আরো অমানবিক বিষয়

হচ্ছে ডাচ সাহিত্য এ হত্যাকাণ্ডকে ঘৃণ্য না বলে ডাচদের বীরত্বের কাহিনী হিসেবে বর্ণনা করেছে। 'ঈশ্বর ডাচদের সাথেই আছেন; কাজেই হত্যা করতে সমস্যা নেই।'

কোম্পানির মহাকাব্যিক পতন

১৬৮০ থেকে ১৭৩০ – এই অর্ধশতক ছিল ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিস্তৃতি, উৎকর্ষ ও সাফল্যের যুগ। ১৭৩০ সালের পর থেকে কোম্পানির সৌভাগ্য ও ধনসম্পদে ভাটা পড়তে থাকে। কোম্পানির পতনের কারণগুলো যেমন ছিল :

১. এশীয় দেশগুলোতে দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবস্থান সংহত হয়। দেশীয় বণিক ও উৎপাদকরা সংগঠিত হতে থাকে, শ্রমবাজারে অসন্তোষ দেখা দেয়। শ্রম শোষণের প্রতিবাদে ইন্দোনেশীয় অঞ্চলে ডাচ কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কোম্পানি কর্মকর্তাদের নির্মমতার কাহিনী নিজ দেশেও সমালোচিত হয়। সুরাট ও বাংলা থেকে কার্যত ডাচরা বিতাড়িত হয়। সিংহল ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে কমে গেলে বাণিজ্যের আকারও হ্রাস পায়। মুনাফার অংকও দ্রুত কমতে থাকে।

২. ইন্দোনেশিয়ার বাটাভিয়া – বর্তমান জাকার্তাকে বহির্দেশীয় প্রধান বাণিজ্য ঘাট করে ডাচ কোম্পানি ব্যবসা সম্প্রসারণ করে। বাণিজ্যিক পণ্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে বাটাভিয়ার কেন্দ্রীয় ডকইয়ার্ডে এনে সেখান থেকে ইউরোপে চালান করা হতো। কিন্তু ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরাসরি চীন থেকে পণ্য ক্রয় করে সমুদ্রপথে ইউরোপে পাঠিয়ে তুলনামূলকভাবে সস্তায় বিক্রি করে ডাচ বাজারের অনেকটাই দখল করে নেয়।

৩. ডাচ কোম্পানির বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

৪. বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিচালকদের অসন্তোষ দমাতে মোট বাণিজ্যিক লাভের চেয়ে বেশি পরিমাণ লভ্যাংশ বিতরণ করতে হয়। পুনর্মূলধন বিনিয়োগে পরিচালকদের মধ্যে অস্বস্তির ভার পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ নিজের মূলধন প্রত্যাহার করে নিতে চান। ১৭৮০ সালে কোম্পানির জাহাজ ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য ও স্থাপনার মূল্যে দাঁড়ায় ২৮ মিলিয়ন গিল্ডার আর বিভিন্ন স্থানে চলমান বাণিজ্যের তহবিলসহ মোট মূল্যমান দাঁড়ায় ৪৬ মিলিয়ন গিল্ডার আর সে সময় কোম্পানির ঋণের পরিমাণ ৬২ মিলিয়ন গিল্ডার। অর্থাৎ ঘাটতি ১৬ মিয়িন গিল্ডার। ইউরোপ ও এশিয়ায় ব্রিটিশ আক্রমণে ডাচদের নৌবহরের প্রায় অর্ধেক বেদখল বা অকেজো হয়ে যায়। ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধে কোম্পানির কেবল ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩ মিলিয়ন গিল্ডার। ১৭৯৯ সালে দেউলিয়া এ কোম্পানির অবসায়ন ঘটে। কোম্পানির অধিকাংশ সম্পদ চলে আসে ব্রিটিশদের দখলে। একদা বিশ্ববাণিজ্যের রাজধানী আমস্টারডাম থেকে লন্ডনে চলে যায়।

▲গণস্বাস্থ্য

সৌজন্যে : *বণিক বার্তা*, ২ জুলাই ২০২১

এম এ মোমেন : সাবেক সরকারি কর্মকর্তা

গলাকাটা দরে সিজারিয়ান কেন?

স্বাভাবিক প্রসব হবার কথা ৮০%

বাধাগ্রস্ত প্রসব ২০%

প্রসব বাধাগ্রস্ত হলে এপিসিওটমী, ফরসেপস, ভ্যাকুয়াম বা সিজারিয়ান অপারেশন প্রয়োজন হয়। অহেতুক সিজারিয়ানে প্রাণনাশের সম্ভাবনাও আছে। গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে প্রসব ব্যয় :

সামাজিক শ্রেণী	স্বাভাবিক প্রসব	সিজারিয়ান প্রসব
অতি দরিদ্র	ফ্রি	১০০০
দরিদ্র	৭০০	৫০০০
মধ্যবিত্ত	২০০০	১৫,০০০
ধনী	৩০০০	১৮,০০০
বীমা বিহীন	৩৫০০	২৫,০০০
গর্ভপাত MR		৩০০০

সিজারিয়ান শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

গণ স্বাস্থ্যবীমা

২৪ ঘণ্টা অল্প খরচে উন্নত চিকিৎসা

পুরো পরিবারের
গণ স্বাস্থ্যবীমার
বাৎসরিক প্রিমিয়াম
দরিদ্র - ৪৫০ টাকা
মধ্যবিত্ত - ২০০০ টাকা
উচ্চবিত্ত - ৩০০০ টাকা

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল
বাড়ি-১৪ই, সড়ক-৬, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন : ৫৮৬১৭২০৮, ০১৭১৭৪১৭০০৯
সিরিয়ালের জন্য : ০১৮৫৬৩৫৪৯৭২
উপ-পরিচালক : ০১৭২৬০৫০২৩৮

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সাভার হাসপাতাল
মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টনমেন্ট (জাতীয় স্মৃতিসৌধের সন্নিকটে), ঢাকা-১৩৪৪
ফোন : ০১৭১৭৭০৬৩২১, ০১৭১৭৫৭৬৫৯৭

নবীন চিকিৎসকগণ নিজের জ্ঞান পরীক্ষা করুন

এ সংখ্যার ৬ নম্বর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত জ্ঞান পরীক্ষার উত্তর

কষ্টগ্রাস বা একিউট ডিসফাজিয়া (Acute dysphagia)-এর সূত্রপাত ও খাওয়ার পর ঘাড়ে ব্যথা
Acute onset dysphagia and neck pain after eating

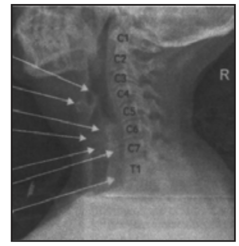

১. সম্ভাব্য রোগ নিরূপণ কী হবে?

উর্ধ্ব খাদ্যনালিয় রন্ধ্রনিয়নন্ত্রক (Upper oesophagegus sphincter) : এটাকে Cricopharyngeusও বলে। এটি দেখতে অর্ধ-গোলাকার পেশির মত যার অবস্থান গলার আডম'স আপেলের তিন ইঞ্চি নীচে। খাদ্য নালি থেকে খাবার যাতে উপরে বা গলায় উঠে না-আসে, সেটা নিশ্চিত করাই এর কাজ)। ও Cricopharyngeus স্তরে নরম খাদ্যপিণ্ড (Food bolus) নিকটস্থ খাদ্যনালি (Proximal oesophagus)-তে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। খাদ্যনালিস্থ বায়ু বুদবুদ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বহিরাগত বস্তু খাদ্যনালি বিঘ্ন সৃষ্টি করছে এবং উন্মুক্ত হতে বাধা দিচ্ছে।

প্রিভার্টিব্রাল নরম টিস্যুর স্ফীতি (Sweeling) বা সার্জিকাল কলাবায়ুস্ফীতির (Surgical emphysema) অনুপস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, প্রতিক্রিয়াশীল স্ফীতি (Oedema), সংক্রমণ, কিংবা কোন ফোঁড়া থাকার সম্ভাবনা কম। ছিদ্র থাকাও সম্ভব নয়।

২. এই অবস্থাটিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন?

বায়ুপথের সম্ভাব্য জটিলতা খতিয়ে দেখতে হবে। স্বত:স্ফূর্ত গমনাগমন পথের অপেক্ষার সময়কালে রোগীর স্বরে পরিবর্তন হয় কিনা এবং কর্কষতা (Hoarsness) বা শ্বাসকষ্ট (Dyspnoea) আছে কিনা তা নিবিড়ভাবে মনিটর করতে হবে। কারণ দীর্ঘক্ষণ এই প্রতিবন্ধকতা বহাল থাকলে তা চারপাশের নরম টিস্যুগুলোকে স্ফীত (Oedema) করে তুলতে পারে।

প্রতিবন্ধকতা (Obstruction) শুরুর ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি খাদ্যপিন্ড নেমে না-যায় তাহলে কঠোর বা নমনীয় গ্রসিকাবীক্ষণ (Oesophagoscopy)-এর কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। রঞ্জনচিত্রে (Radiography) যদি হাড়ের উপস্থিতি দেখা যায়, অথবা খাদ্যনালিতে ছিদ্র সৃষ্টি হয় (বুকের ব্যথা পিঠের দিকে যাচ্ছে বা হৃদদ্রুতি/Tachycardia বা জ্বরানুভব/Pyrexia হচ্ছে) তাহলে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

ব্যাটারি বা চুম্বকজনিত খাদ্যনালির প্রতিবন্ধকতা (শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়) থাকলে তা দুই ঘন্টার মধ্যে কোষমৃত্যু (Tissue necrosis) ও ছিদ্র সৃষ্টি করতে পারে। এবং সাথে সাথে গ্রসিকাবীক্ষণ (Oesophagoscopy)-এর ব্যবস্থা করা ও অপসারণের প্রয়োজন হবে।

৩. এই বয়সের রোগীর ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আর কী কী অনুসন্ধান প্রয়োজন হতে পারে?

মধ্যবয়স্কদের নিহিত কারণ জানতে যা করণীয় : গ্রসিকাবীক্ষণ (Oesophagoscopy)-ও কলাচ্ছেদন (Biopsy)-এর মাধ্যমে Eosinophilic oesophagitis-এর সম্ভাবনা দূর করা। খাদ্যনালির প্রতিবন্ধকতার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণের ভেতর আছে এসোফেগাল জাল (Oesophageal web) বা আঁটো ভাব বা সংবৃতি (বিরল ক্ষেত্রে ক্যান্সার)। এটা গ্রসিকাবীক্ষণ (Oesophagoscopy) বা পার্থক্যসূচক গলাধ:করণ (Contrast swallow) এ বিষয়টা নজরে আসতে পারে। যেসব রোগীতে খাদ্য পিন্ড স্বত:স্ফূর্তভাবে অতিক্রম করে তাদের ক্ষেত্রে বহির্বিভাগ সাক্ষাতকারের সময় এটির ব্যবস্থা করা হয়। তাদের ক্ষেত্রে পুন:পুন কষ্টগ্রাস (Dysphagia), খাবার দৃঢ়ভাবে একত্রে ঠেসে থাকা ও খাদ্য উদগিরণের লক্ষণ থাকলে চিকিৎসকের চেম্বারে গ্রসিকাবীক্ষণ (Oesophagoscopy)-এর প্রয়োজন পড়ে না।

শিক্ষণীয় বিষয়

• প্রাথমিকভাবে সতর্ক ব্যবস্থাপনার সাথে স্বতঃস্ফূর্ত দৃঢ়ভাবে একত্রে না ঠাসা ও স্বতঃস্ফূর্ত গমনাগমন পথের জন্য নির্দিষ্ট সময় অবধি পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করা যায়।

• বোতাম ব্যাটারি (তাৎক্ষণিক), সূক্ষাগ্র পিন্ডের উপস্থিতি (দুই ঘন্টার মধ্যে), বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতিক্রম না করতে পারলে (২৪ ঘন্টার মধ্যে) অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হবে।

• বায়ুপথ জটিলতা বা ছিদ্রের সন্দেহ থাকলে দ্রুত অস্ত্রোপচার করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

রোগীর পরিণতি

রোগীকে নাক, কান, গলা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিলো। সারারাত পর্যবেক্ষণের সময় শিরামধ্যে তরল ও বেদনানাশক দেয়া হয়েছে। সকালে গলায় আটকে থাকা পিন্ড স্বত:স্ফূর্তভাবে অতিক্রম না করায় রোগীকে সাধারণ চেতনানাশকের অধীনে গ্রসিকাবীক্ষণ (oesophagoscopy) করা হয়। নিকটস্থ খাদ্যনালি (proximal oesophagus) হতে একটি মাংসের একটি বড় টুকরা অপসারণ করা হয়। পরে ঐ দিন রোগী ছাড়া পায়। রোগীর দৃঢ় গ্রসিকাবীক্ষণ (oesophagoscopy)-এর সময় কোন ধরনের অস্বাভাবিকতা না দেখা যাওয়ায় কোন ফলোআপের দরকার হয়নি।

British Medical Journal, 20 March 2021

ধারাবাহিক

মশা থেকে সৃষ্ট ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু এবং অন্যান্য অসুস্থতা

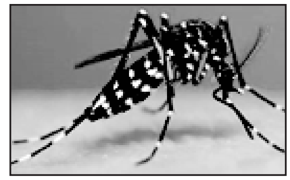

[স্পানিস ভাষায় মশাকে ছোট পোকা বা স্মল ফ্লাই (Small fly) বলে। ডাইনোসর যুগের সময় থেকেই মশার উপস্থিতির কথা জানা যায়। অর্থাৎ ৪০০ মিলিয়ন বছর আগেও মশা ছিল। তবে সে সময়ে মশা ছিল বর্তমান সময়ের মশার তুলনায় তিনগুণ বড়। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস আফ্রিকা থেকেই মশার উদ্ভব এবং সেখান থেকেই ক্রমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।
মশার সাথে ম্যালেরিয়ার সম্পর্কের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস (Roland Ross)। ১৮৯৭ সালের ২০ আগস্ট বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস ভারতের সেকেন্দ্রাবাদে এই যুগান্তকরী আবিষ্কারেরের কথা জানান দেন। তবে মশা কেবল ম্যালেরিয়া নয়; আরও বহু রোগের কারণ। যার ভেতরে আছে পীত জ্বর (Yellow fever), চিকুনগুনিয়া (Chikungunia), ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস (West Nile virus), এনসেফালাইটস (Encephalitis) প্রভৃতি। বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন দেশে মশার কারণে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে যে রোগ; সেটি হলো ডেঙ্গু (Dengue)। বাংলাদেশে জুলাই থেকে ডিসেম্বর অবধি ডেঙ্গু রোগের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায় ফি-বছর। মূলত জনসচেতনতার অভাবে প্রতি বছর আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হবার পাশাপাশি ব্যাপক প্রাণহানিও ঘটে। অথচ খানিকটা সচেতন হলে এসব মৃত্যু এড়ানো যায়। এই প্রেক্ষাপটে আমরা এই সংখ্যা থেকে প্রকাশ করছি মশা-সৃষ্ট রোগের ওপর এই ধারাবাহিকটি। এটি প্রকাশের সদয় অনুমতি দিয়েছেন Hesperian Health Guides-এর Tawnia Litwin. এজন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করি এর মাধ্যমে পাঠকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষা পাবেন।]

[গত সংখ্যার পর]

ডেঙ্গু, পীত জ্বর, জিকা এবং চিকুনগুনিয়া

এই মশা অনেক অসুস্থতার সৃষ্টি করে। এর পাগুলো সাদাকালো ডোরাকাটা।

ডেঙ্গু, পীত জ্বর, জিকা এবং চিকুনগুনিয়া হলো ভিন্ন ভিন্ন রোগ। এর প্রতিটি একটি ভিন্ন ভাইরাসের কারণে হয়। এগুলো সাদা পটিযুক্ত বা সোনালী রঙের ফুটকিযুক্ত ও ডোরাকাটা পা-ওয়ালা কালো মশার দ্বারা ছড়ায়। এর মধ্যে দু'টি হলো পীত জ্বরের মশা (এডিস এজিপ্টি) এবং এশিয় বাঘ মশা (এডিস এলবোপিকটাস)। এগুলো সাধারণত দিনের বেলায় কামড়ায় – বিশেষ করে খুব ভোরে এবং শেষ দুপুরের দিকে যেখানে মানুষ জল সংরক্ষণ করে এবং যেকোন জায়গা যেখানে জল জমে সেখানে বংশবৃদ্ধি করে। এই মশাগুলো সাধারণত ঘরের মধ্যে বা কাছাকাছি বাস করে। মূলত ছায়াযুক্ত, অন্ধকার জায়গা যেমন টেবিল বা বিছানার নীচে বা অন্ধকার কোণাগুলোতে থাকে। যদি জিকা, ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়ার সবগুলোই আপনার এলাকায় থাকে তবে একজন ব্যক্তি কোন্ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তা বলা কঠিন হতে পারে।

ডেঙ্গু, পীত জ্বর, জিকা এবং চিকুনগুনিয়ার সাধারণ লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানুন। এর যে কোন একটি জ্বর এবং শরীরে ব্যথার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির কোন লক্ষণ একেবারেই দেখা যায় না। যতক্ষণ না তারা একটি রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হচ্ছে যে তারা অসুস্থ হয়েছে। আপনার যদি কোন লক্ষণ না-ও থাকে তবুও নতুন করে মশা কামড় দিলে সেই মশা যদি আবার অন্যদেরকে কামড়ায় তবে এই রোগটি অন্যদের মধ্যে ছড়াবে।

ডেঙ্গু, পীতজ্বর, জিকা এবং চিকনগুনিয়ার চিকিৎসা একই রকম

বেশিরভাগ সময়ই মশা থেকে ছড়ানো এই ৪টি ভাইরাসের অসুস্থতার চিকিৎসা ঘরেই করা হয়, কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে, বৃদ্ধ ব্যক্তি বা এইচআইভিযুক্ত ব্যক্তি, বা ৪০° (১০৪° ফা.) উপরে জ্বরসহ যে কোন বিপদচিহ্নের ক্ষেত্রে একজন স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে দেখা করুন।

ডেঙ্গু, পীত জ্বর, জিকা বা চিকুনগুনিয়া ভাল করার কোন ওষুধ নেই। এগুলো বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেয়া, প্রচুর পরিমাণে পানি এবং অন্যান্য তরল পদার্থ পান করা এবং ব্যথা ও জ্বর কমানোর জন্য পারাসিটামল (এ্যাসিটামিনোফেন) খাওয়ার মাধ্যমে এর চিকিৎসা করা হয়। পারাসিটামল ব্যবহার করা এসপিরিন বা ইবুপ্রোফেনের তুলনায় নিরাপদ। কারো যদি গুরুতর ডেঙ্গু দেখা দেয় তবে ইবুপ্রোফেন বিপজ্জনক হতে পারে। একজন নারী যদি গর্ভধারণ করে তবে এসপিরিন ও ইবুপ্রোফেন তার গর্ভে থাকা শিশুর জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে কিন্তু পারাসিটামল ব্যবহার নিরাপদ।

ডেঙ্গু, পীত জ্বর, জিকা বা চিকুনগুনিয়া রোধ করার উপায় একই

অসুস্থতা রোধ করতে মশার কামড় রোধ করুন এবং মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করুন। পীত জ্বর রোধ করার জন্য একটি টিকা রয়েছে।

ডেঙ্গু জ্বর (হাড়-ভাঙ্গা জ্বর)

ডেঙ্গু সাধারণত উত্তপ্ত বর্ষাকালে দেখা যায়। এগুলো শহর ও যে সমস্ত এলাকায় মানুষের ঘন বসতি থাকে সেখানে বেশি দেখা যায়। মানুষ যেখানে পানি সংরক্ষণ করে এবং যে কোন জায়গা যেখানে

পানি জমা হয় – যেমন বিভিন্ন পাত্র এবং পানি নিষ্কাষণের ভাল ব্যবস্থা না থাকা ভূমিতে মশা বংশবৃদ্ধি করে।

প্রথমবার ব্যক্তির যখন ডেঙ্গু হয় তখন সে সহজেই বিশ্রাম নিয়ে ও প্রচুর পরিমাণে তরল পদার্থ পান করে সাধারণত ভাল হয়ে উঠতে পারে। যখন ব্যক্তিটি দ্বিতীয় বার বা তারপর যে কোন বার ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে তা জীবনের জন্য অনেক বেশি বিপজ্জনক।

এই অসুস্থতা সাধারণত দেহে ব্যথাসহ হঠাৎ উচ্চমাত্রার জ্বর দিয়ে শুরু হয়। তিন-চার দিন পর ব্যক্তিটি হয়তো ভাল অনুভব করতে পারে কিন্তু হাতে ও পায়ের পাতায় ফুসকুড়ি দেখা দেয়। এই ফুসকুড়ি বাহু, পা এবং দেহে ছড়িয়ে যায় (কিন্তু সাধারণত মুখমণ্ডলে না)। ডেঙ্গুতে অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে বেশিরভাগ লোকেরই উচ্চ মাত্রায় জ্বর হয় এবং অন্যান্য লক্ষণগুলোর দুই বা তার বেশি দেখা দিতে পারে।

ডেঙ্গুর লক্ষণ

* হঠাৎ উচ্চ মাত্রার জ্বর, ৩৯° (১০২° ফা.) বা তারও বেশি মাত্রায়।
* পেশি ও অস্থি উভয় জায়গায় তীব্র ব্যথা (সে কারণে ডেঙ্গুকে মাঝে মাঝে হাড়-ভাঙ্গা জ্বর বলা হয়)।
* মাথা ব্যথা, চোখের পিছনে ব্যথা।
* ফুসকুড়ি (Rash)।
* গলা ব্যথা।
* গা গুলায় বা বমি হয়।
* শরীরে কাঁপুনি ধরে।
* চরম ক্লান্তি।

চিকিৎসা গ্রহণ করলে তা আপনাকে ভাল অনুভব করায় সাহায্য করবে। কিন্তু গুরুতর ডেঙ্গুর বিপদচিহ্নগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখুন। এগুলোর যদি ততক্ষণাৎ চিকিৎসা করা না হয় তাহলে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে।

গুরুতর ডেঙ্গুর বিপদ চিহ্ন

* ত্বকের উপর রক্তের ছোট ছোট দাগ বা নাক, কান বা মুখ থেকে রক্ত।
* পেট ফুলে যাওয়া বা বমি বা মলের সাথে রক্ত (পেটে রক্তক্ষরণের কারণে)।
* খেতে ও পান করতে অসমর্থ।
* বিভ্রান্তের মতো আচরণ করে, নাড়ি দ্রুত চলে, ত্বক ঠাণ্ডা হয়ে যায় বা মর্মাহত হওয়ার অন্যান্য চিহ্ন দেখা যায়। যেখানে রক্ত পরীক্ষা করা যায় সেখানে হেমাটোক্রিট বেশি থাকা বা প্ল্যাটিলেট কম থাকা বলে দেয় যে এখানে কোন সমস্যা আছে।

গুরুতর ডেঙ্গুর চিকিৎসা শুধুমাত্র শিরার মাধ্যমে তরল পদার্থ প্রবেশ করানো এবং রক্তক্ষরণের চিকিৎসা করার মাধ্যমে করা যায়। বিপদ চিহ্ন দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে যান।

রোধ করা

মশার কামড় এড়িয়ে চলুন এবং মশার বংশবৃদ্ধি হওয়া রোধ করুন।

পীত জ্বর

পীত জ্বর আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় বেশি দেখা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বৃষ্টিপ্রধান জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষদের জঙ্গল পীত জ্বর হতে পারে। কিন্তু সব থেকে সাধারণ যে ধরনটি দেখা যায় তাকে শহুরে পীত জ্বর বলা হয়।

বেশিরভাগ লোকই সম্পূর্ণভাবে পীত জ্বর থেকে নিরাময় লাভ করে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে, যার মানে হলো যে তাদের আর পীত জ্বর হবে না। অল্প সংখ্যক ব্যক্তির গুরুতর পীত জ্বর হয়, কিন্তু চিকিৎসা করলে তারাও সাধারণত নিরাময় হয়।

পীত জ্বরের লক্ষণ

* জ্বর
* শীত শীত লাগা
* পেশিতে ব্যথা (বিশেষ করে পিঠে ব্যথা)
* মাথা ব্যথা
* ক্ষুধা মন্দা
* গা গুলানো এবং বমি
* নাড়ি ধীরে চলা
* আলোতে চোখের স্পর্শকাতরতা
* ত্বক, চোখ, জিহ্বায় লালচে ভাব।

বেশিরভাগ মানুষের জন্যই এই অসুস্থতা তিন বা চার দিন পর চলে যায়। চিকিৎসা আপনাকে ভাল অনুভব করায় সাহায্য করতে পারে। কিন্তু বিপদ চিহ্নের দিকে লক্ষ্য রাখুন।

গুরুতর পীত জ্বরের লক্ষণ

গুরুতর পীত জ্বরে ভাল অনুভব করার কয়েক ঘন্টা বা প্রথম দিনের পর উচ্চ মাত্রার জ্বর নীচের কোন কোন চিহ্নসহ ফেরত আসতে পারে :

* কামলা (চোখের সাদা অংশ বা হালকা রঙের ত্বক হলুদ হয়ে যায়)।
* তলপেটে ব্যথা
* মুখ, নাক বা চোখ থেকে রক্তক্ষরণ।
* বমি
* বমি বা মলে রক্ত (পেটের ভিতরে রক্তক্ষরণের কারণে)।

এই বিপদচিহ্নগুলোর কোন একটি যদি দেখা যায় তবে তৎক্ষণাৎ কোন একটি হাসপাতালে যান।

প্রতিরোধ

টিকা পীত জ্বর রোধ করে। এছাড়াও মশা যাতে কামড়াতে না পারে সেটা নিশ্চিত করুন এবং মশার বংশ বিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

▲**গণস্বাস্থ্য**

[চলবে]